গণতন্ত্রের রূপ

পরিতোষ রায়

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

বর্ত্তমান পুস্তকে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে খানিকটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে মুখ্যত নির্ভর করা হ'য়েছে দেশী ও বিদেশী সাময়িকীর উপর। এদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য: 'নিউ টাইম্‌স্', 'নিউ ম্যাসেস্', 'লেবার মান্থলী', 'সোভিয়েট উইক্‌লী', 'নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান্ এ্যাণ্ড নেশন্', 'লেবার রিসার্চ্', 'পিপ্‌ল্‌স্ এজ' প্রভৃতি। এ ছাড়া যে-সকল মূল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে, তাদের নাম প্রতি অধ্যায়ের শেষে যোগ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বাধুনিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি; সোভিয়েট সংক্রান্ত আলোচনায় এ দুর্ব্বলতা অধিকতর স্পষ্ট। বানান সম্পর্কেও কোন স্থির পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এটি একটি মৌলিক ত্রুটি। কিন্তু আদ্যোপান্ত অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে কেবল দুই একটির উল্লেখের সার্থকতাই বা কি?

পুস্তক প্রণয়নে যাঁদের কাছে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে ঋণী তাঁদের নাম স্মরণ ক'রে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শেষ করি।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমিত সেন বইখানার পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বন্ধুবর কল্যাণ দত্ত ও অনিল কাঞ্জিলাল নানা দিক থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই কল্যাণীয়া প্রতিমা রায়কে। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এ বই লেখাই হয়তো সম্ভব হ'য়ে উঠত না।

কলিকাতা
সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

পরিতোষ রায়

মণ্টুর স্মারক

সূচী

ভূমিকা

'পশ্চিমী গণতন্ত্র' কথাটি সম্প্রতি বেশ চালু হয়ে উঠেছে। গত কয়েক মাস ধ'রে কথাটা এমন ভাবে আমাদের মনে এঁকে দেবার চেষ্টা চ'লেছে যাতে ক'রে ভাবা স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের বিস্তার একমাত্র পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই দাবী কত দূর যুক্তিসঙ্গত তা খানিকটা যাচাই ক'রে দেখবার জন্তেই এই ভূমিকার অবতারণা। কিন্তু তার পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন যে, ঠিক যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই কথাটার উপর এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে কেন এবং দিচ্ছেই বা কারা। অর্থাৎ এ গুরুত্ব আরোপের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি ?

যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করলেই এ প্রশ্নের উত্তর মেলে। ফ্যাশিস্ত-অভ্যুত্থানের স্বপ্নকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে সারা দুনিয়ায় আজ বিপ্লবী গণআন্দোলন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্ব ইওরোপের বিস্তৃত ভূখণ্ডে জনশক্তি আজ এক নূতন জীবন গঠনে উদ্যোগী। ফ্রান্স ও ইতালীতে, ইরানে ও চীনে গণ-আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান তেজে প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত। এশিয়া এবং আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলি আজ মুক্তির দাবীতে চঞ্চল। মিশর এবং ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীন, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। বিশ্বব্যাপী এই গণ-আন্দোলনে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব। দেশে দেশে বামপন্থী নেতৃত্বের বিপুল

প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক অভ্যুত্থান এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার স্বভাবতই সোভিয়েটের বিস্তৃত প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশিয়া যে দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দেয়, তার প্রাণকেন্দ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, এই সহজ উপলব্ধিই সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের অন্যতম মূল প্রেরণা।

দুনিয়া জোড়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-বিক্ষোভের প্রচণ্ড আঘাতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গোটা কাঠামোটা টলমল ক'রে কেঁপে উঠেছে। পুরাতন পৃথিবীর অবসান আসন্ন বুঝতে পেরে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে, সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকেই কেবল তীব্রতর ক'রে তুলছে। এ সঙ্কট থেকে রক্ষণশীল স্বার্থকে রক্ষা পেতে হ'লে শুধু আন্তর্জ্জাতিক গণআন্দোলন দমনই যথেষ্ট নয়, সোশালিস্ট রুশিয়ার উপরও প্রত্যক্ষ আঘাত হানা অপরিহার্য্য। বৃটেন এবং আমেরিকা আজকের আন্ত-র্জ্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রধান নায়ক। এর কারণও স্পষ্ট। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক স্বার্থ বিস্তৃত। আভ্যন্তরীণ আর্থিক শক্তির চাপে প্রসারের প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্প্রতি আরও বেড়ে গেছে। আজ তাই অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর ফ্রান্সের রাষ্ট্রিক চেহারার দ্রুত পরিবর্ত্তন হওয়াতে, ইঙ্গ-মার্কিন শাসক শ্রেণীই ধনতান্ত্রিক স্বার্থের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিভূ। যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের নেতৃত্বভার যে এদের উপরই এসে পড়বে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বস্তুত ইঙ্গ-মার্কিন শাসক শ্রেণীর অধুনাতন কার্য্যাবলী বিশ্লেষণে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে, আজ এদের একমাত্র চেষ্টা হচ্ছে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সহযোগিতায় এমন এক সোভিয়েট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সঙ্ঘ গড়ে তোলা, যার

সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক মুক্তি-আন্দোলন ধ্বংস করা চলে, সোভিয়েটের ক্ষমতাকে খর্ব্ব করা যায় এবং ধনিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়। এট্‌লী এবং ট্রুম্যান, বেভিন এবং মার্শাল—প্রত্যেকের যুক্তি এবং কাজে এই সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু ফাশিজ্‌মের পরাজয়ের পর আজকের পরিবর্ত্তিত পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়া অথবা পূর্ব্বাঞ্চলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সরাসরি আক্রমণ করা সহজ নয়। বৃটেন আমেরিকার জাগ্রত শ্রমিক-আন্দোলনের দৃষ্টি থেকে প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী উদ্দেশ্য ঢেকে রাখবার জন্য চাকচিক্যময় মুখোশ ব্যবহারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। ‘পশ্চিমী গণতন্ত্র’, ‘পাশ্চাত্য সভ্যতা’ প্রভৃতি বুলি আসলে সেই মুখোশেরই শামিল। এই সকল ঘৃণ্য ছদ্মবেশের আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থসমাবেশের বিরাট আয়োজন চলেছে।

সোভিয়েট-বিরোধিতা এক হিসাবে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক রাজনীতির দিগ্‌দর্শন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লবের পর থেকে পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহের মধ্যে যে-সকল পারস্পরিক রাষ্ট্রিক সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হ’য়েছে, তার অন্যতম মূল প্রেরণা সোভিয়েট-বিরোধিতা। ১৯১৮ সালে বলশেভিকরা যখন বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় মগ্ন, তখন শিশু সোভিয়েটকে নির্ম্মূল করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ চৌদ্দটি ধনিক রাষ্ট্র একযোগে রুশিয়া আক্রমণ করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে যখন পশ্চিমে শ্রমিক-অসন্তোষ ব্যাপক হ’য়ে পড়ে এবং সোভিয়েটে সামরিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ অভিযান বাধ্য হ’য়ে বন্ধ করতে হ’ল। যুদ্ধান্তের নূতন সীমা নির্দ্ধারণের বেলাতেও সোভিয়েট রুশিয়া অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরাজিত জার্মানীতে

জঙ্গীবাদ প্রতিষ্ঠা করবার ঐকান্তিক চেষ্টার মধ্যেও সমাজতন্ত্রের দুর্গকে আঘাত করবার ইচ্ছাই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। যুদ্ধ জয়ের পর যে-উৎসাহ নিয়ে মিত্রপক্ষ জার্মানীর সমগ্র সামরিক শক্তি ধ্বংস ক'রে ভের্সাই-এর সন্ধিপত্র রচনা করে, তার চাইতে বেশী উৎসাহ নিয়েই কিন্তু তারা পরবর্ত্তী দুই দশকে সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে জার্মানীকে সাহায্য করে। কার্জন প্রস্তাব, লোকার্নো চুক্তি, আর্ক্‌স্ 'রেইড' প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির যে-চেহারা ধরা পড়ে, তাতে সোভিয়েটকে বাধা দেবার উপায় হিসাবে জার্মানীকে গ'ড়ে তোলবার প্রয়াসই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জার্মানীতে ফ্যাশিস্ত অভ্যুদয়ের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েই বৃটেন ক্ষান্ত হয়নি, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ১৯৩৫-এর প্রথম দিকে জার্মানী যখন বারবার ভের্সাই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করতে শুরু করে, ইংলণ্ড তাতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, প্রকারান্তরে উৎসাহই দেয়। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তিতে (জুন, ১৯৩৫) বৃটেন স্বীকার ক'রে নিল যে, জার্মানী বৃটিশ নৌ-বহরের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ পর্য্যন্ত রণতরী রাখতে পারবে। এরপর হিটলারের ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর নিকট পশ্চিমের ধনিক রাষ্ট্রগুলি বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে থাকে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে মিউনিকের চুক্তিতে হিটলারের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে চেকোস্লাভ গণতন্ত্রকে বলি দেওয়া হ'ল। অস্ট্রিয়া ও স্পেন, ইথিওপিয়া ও আলবেনিয়া সর্ব্বত্রই এইভাবে ফ্যাশিস্ত অগ্রগতির পথ খুলে দেওয়া হয়।

এর কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। নাৎসি কর্ত্তৃত্বের বিস্তার রোধ করতে হ'লে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতা অপরিহার্য্য। কিন্তু চেম্বারলেন দালাদিয়ে প্রমুখ ধনিক প্রধানদের ভয় ছিল যে, এ সহযোগ পরিণামে বলশেভিক মতবাদকেই শক্তিশালী ক'রে তুলবে। তাই শ্রেণীস্বার্থ

অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে পশ্চিমের রক্ষণশীল শাসকগণ হিটলারের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্যে যে-সিংহশাবককে বৃটেন দীর্ঘদিনের যত্নে বড় ক'রে তুললো, সে-ই শেষে বৃটিশ স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী বাধা হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৩৯-এর শেষের দিকে নাৎসি অভিযান পশ্চিম ইওরোপের বিরুদ্ধেই চালিত হ'ল। কিন্তু এ সত্ত্বেও ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের গতিকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা বৃটেনকে করতে দেখা যায়। ১৯৪০-এর জুন মাসে ফ্রান্সের পতন এবং ইংলণ্ডে ব্যাপক বোমাবর্ষণই নাৎসি অভিসন্ধি সম্বন্ধে রক্ষণশীল বৃটেনকে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ ক'রে তুলেছিল।

১৯৪১-এর ২২শে জুন পশ্চিমের শাসক শ্রেণীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিনের সন্ধান মেলে। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ-চুক্তির শর্ত্ত লঙ্ঘন ক'রে নাৎসি বাহিনী অতর্কিতে রাত্রির অন্ধকারে সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করে। এ-সুযোগকে কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থে ব্যবহার করা ততদিনে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। শ্রমিক-কৃষকের দেশের উপর সঙ্ঘবদ্ধ পুঁজিবাদের সশস্ত্র আক্রমণ যে আসলে আন্তর্জ্জাতিক গণ-আন্দোলনের উপরই প্রচণ্ডতম আঘাত তা' বোঝা কঠিন নয়। যুদ্ধের রূপান্তরিত প্রকৃতি সম্বন্ধে দেশে দেশে জনগণ সচেতন হ'য়ে উঠলো। বৃটেনের বিরাট জনমতের চাপে ইংলণ্ডের শাসক শ্রেণী বাধ্য হ'ল সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে হাতে মেলাতে। যে-চার্চিল ১৯১৮-২১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধনিক রাষ্ট্রের অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁকেই বৃটেনের জনগণ কুড়ি বছরের জন্যে ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

জনমতের চাপে যদিও বৃটেনের শাসক সম্প্রদায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, বলশেভিক রুশিয়া অথবা সাম্যবাদ

সম্পর্কে তাদের পুরাতন বিদ্বেষ কিন্তু অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের অনুসৃত দ্বৈতনীতির মধ্যেই তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। রুশিয়ার সাহায্যে হিটলারের সাম্রাজ্যবাদী অগ্রগতি রোধ করবার দুরন্ত আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিজ্‌মের পতন যাতে সাম্যবাদী বিপ্লবের পথ খুলে না দেয় সে-বিষয়েও তাদের তীক্ষ্ণ সতর্কতা ধরা পড়ে। ১৯৪১-এর ৩১শে জুলাই বৃটেনের তৎকালীন বিমান-উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী মূর ব্র্যাবাজন এক গোপনীয় বৈঠকে রুশ-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে যে-অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে গভর্নমেণ্টের আসল উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই তিনি বলেন যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধের আঘাতে দুই শক্তিই নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে; ইতিমধ্যে সামরিক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যুদ্ধোত্তর ইওরোপে কর্তৃত্ব করবার শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখাই বৃটেনের লক্ষ্য। সরকারী নীতিকে এত পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করবার অপরাধে মূর ব্র্যাবাজনকে শীঘ্রই মন্ত্রীত্বের গদী থেকে বিদায় নিতে হ'ল।

ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কার্য্যকলাপের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। এমনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয় যাতে প্রধান আঘাত সোভিয়েট রুশিয়ার উপর গিয়ে পড়ে। লালফৌজ যখন বুকের রক্ত দিয়ে একাকী ফ্যাশিস্ত বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে লড়ছিল, ইংরেজ সৈন্য কিন্তু তখন কোনো রণাঙ্গনেই সক্রিয় নয়। তারপর ১৯৪২-এ শীতের পর যখন সোভিয়েটের প্রথম পাল্টা-আক্রমণ শুরু হয়, মলোটভ নিজে লণ্ডনে এলেন যাতে পশ্চিমেও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তি আক্রমণ আরম্ভ করে। তাঁকে সরকারী ভাবে কথা দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত সেকথা রাখা হ'ল না। সোভিয়েট বাহিনী পুরো তিন বছর সংগ্রাম ক'রে জার্মান আক্রমণ সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিহত করবার পর ১৯৪৪-এর জুন

মাসে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়। ক্যাপ্টেন বুচারের স্মৃতিকথা থেকে আজ জানতে পারা গেছে যে, জেনারেল আইসেনহাওয়ার এবং অন্যান্য সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও শুধু এক চার্চিলের জিদের জন্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে এতটা বিলম্ব ঘটে। এই জিদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা সহজ।

কিন্তু এত চেষ্টার পরেও সোভিয়েটকে ঘায়েল করা সম্ভব হ'ল না, বরং যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে রুশিয়ার মর্য্যাদা বিপুল ভাবে বেড়ে গেল। সারা দুনিয়ার যুদ্ধক্লান্ত জনগণ ভবিষ্যত বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে ত্রিশক্তি-মিলনের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করবার দাবী জানাতে থাকে। এই সব কারণেই পুরাতন সোভিয়েট-বিরোধী নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। এতদিন রুশিয়াকে দিয়েই ইঙ্গ-মার্কিন কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা এগিয়ে চলছিল। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুইবেকের দ্বিতীয় বৈঠকে চার্চিল এবং রুজভেল্টের মধ্যে গোপনে স্থির হয় যে, জার্মান সৈন্য অপসারিত হবার পর গ্রীসের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দমন করবার জন্যে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য নিযুক্ত করা হবে। সোভিয়েটের দুর্জ্জয় ক্ষমতা প্রমাণিত হবার পর রুশিয়াকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ত্রিশক্তির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রশ্নকেও আর এড়ানো সম্ভব হ'য়ে উঠলো না। মস্কো, তেহেরান এবং ক্রিমিয়ার প্রতিজ্ঞা এরই স্বাভাবিক পরিণতি। ক্রিমিয়া এবং তেহেরান সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধের ন্যায় শান্তিকালেও ত্রিশক্তি একযোগে কাজ করবার নীতি অনুসরণ করবে, কারণ ভবিষ্যৎ শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ-সহযোগিতা অপরিহার্য্য।

কিন্তু এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে শীঘ্রই ফাটল দেখা গেল। আণবিক

বোমার প্রত্যক্ষ কার্য্যকারিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিশক্তি সহ-যোগিতার নীতি অনুসরণে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের উৎসাহ কমে আসে। পশ্চিমের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া এই ভেবে সতেজ হ'য়ে উঠলো যে, এই সর্ব্বনাশা অস্ত্রটির মালিকানা একচেটিয়া ক'রে নিতে পারলে সোভিয়েট রুশিয়াকে পঙ্গু করা কঠিন নয়। মিত্রশক্তিত্রয়ের সম্বন্ধের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব এতদিন অপ্রকাশ ছিল এইবার তা স্পষ্টভাবে দেখা দিল। আণবিক বোমার কল্পিত শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই চার্চিল ফুল্‌টন গিয়ে বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীলদের একজোট হবার জন্য হাঁক ছাড়লেন। চার্চিলের প্রতিধ্বনি আজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বৃটেন এবং আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিবদের কণ্ঠে। আজ তাঁরা যে-নীতির অনুসরণ ক'রে চলেছেন তাতে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলবার আভাস তো নেই-ই ; বরং সহযোগিতার ভিত্তিকে কি ক'রে সব দিক থেকে দুর্ব্বল ক'রে তোলা যায়, তারই প্রাণপণ চেষ্টা স্পষ্ট ধরা পড়ছে। নিরাপত্তা-পরিষদে এবং পররাষ্ট্রসচিব-সম্মেলনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়ছে।

এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, আণবিক বোমা যতদিন না বে-আইনি করা যায়, ততদিন আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আণবিক শক্তি কমিশনের নিকট মার্কিন এবং সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে যে-দু'টি পরিকল্পনা উত্থাপিত হ'য়েছিল তার মধ্যে আমেরিকার 'বারুচ প্রস্তাব' কমিশনে গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু 'বারুচ পরিকল্পনা'র সঙ্গে 'গ্রোমিকো প্রস্তাবের' পার্থক্য এতটা মৌলিক যে, এদেরকে দুটি মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা হিসাবে কল্পনা করা কঠিন। বারুচ-প্রস্তাবের বিস্তাবিত

আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পরিকল্পনাটির মূল অংশে প্রধান রাষ্ট্র-গুলির 'ভিটো' ক্ষমতার প্রত্যাহার দাবী করা হ'য়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আনীত গ্রোমিকো প্রস্তাবের মূল দাবী ছিল আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। দুটি প্রস্তাব পাশাপাশি রেখে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, সোভিয়েট এবং মার্কিন সরকারের মূল উদ্দেশ্যের ভেতর পার্থক্য কত গভীর। গ্রোমিকো-পরিকল্পনা যেখানে আণবিক শক্তিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করবার পক্ষপাতী, বারুচ-পরিকল্পনা সে-জায়গায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা ক'রেছে যে, আণবিক অস্ত্রের নির্ম্মাণ ধীরে ধীরে বন্ধ করবার পূর্ব্বে পৃথিবীর যাবতীয় ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম ধাতু 'আন্তর্জ্জাতিক' কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন। মার্কিন প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন নয়। আণবিক অস্ত্রের গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পৃথিবীর সমস্ত ইউরেনিয়াম করায়ত্ত করবার উদগ্র লোভই এতে ফুটে বেরিয়েছে। বারুচের পরামর্শদাতাদের মধ্যে যথন জন হ্যানকক্ এবং হার্বার্ট বেয়ার্ড সোপের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্ধান মেলে, তখন এ পরিকল্পনা কাদের স্বার্থে প্রণোদিত তা বোঝা সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বারুচ-পরিকল্পনার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি 'ভিটো' ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবী।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ গঠনের সময় থেকেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিক্রিয়াশীলদের কাম্য নয়। ডাম্বারটন ওক্স্-এর আলোচনার সময় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রবল বিরোধিতার ফলে মিত্রপক্ষ মতৈক্য-নীতি সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেননি। ক্রিমিয়া বৈঠকে এই নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিত্রপক্ষ একমত হন। সানফ্রানসিসকো বৈঠকে

বৃহৎ শক্তিগুলির 'ভিটো' ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা কিন্তু প্রথম থেকেই তাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের জিগির তুলে তুনিয়ার সেরা সেরা রক্ষণশীল গোষ্ঠী 'পঞ্চপ্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা'র অবসান দাবী করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, হিটলার গোয়েবল্‌স্ প্রমুখ নাৎসি প্রধানদের প্রচারনীতিও অবিকল এই খাতেই অনুসৃত হ'য়েছে। মিত্রশক্তির মধ্যে আদর্শগত বৈষম্যের ফাঁকে বিভেদ সৃষ্টি—ফ্যাশিস্তদের মুলমন্ত্র ছিল বলা চলে। পরাজিত ফ্যাশিজ্‌ম্ আজও সেই আশা নিয়েই বেঁচে আছে। ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা তুনিয়ার রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া বৃহৎ শক্তি-বর্গের ঐক্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আঘাত হানছে। বারুচ-প্রস্তাবকে এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই সঙ্গত। বারুচ-প্রস্তাবের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সমাবেশ আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থী ধনিকগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে উপলব্ধি ক'রেছে যে, ত্রিশক্তি সহযোগিতার আসল পরিণাম সমাজতন্ত্রের ব্যাপক বিস্তার, সোভিয়েটের শক্তি বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাদের ক্ষয়। এতদিন ভ্যাণ্ডেনবুর্গ, লিপম্যান প্রমুখ ধনিক প্রতিভূরা যে-কথা বেসরকারী ভাবে বলে আসছিলেন এইবার প্রতিক্রিয়াশ্রিত ট্রুম্যান এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন কর্তৃক বারুচের মারফৎ সরকারী ভাবে তা সমর্থিত হ'ল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের একটা প্রধান শর্ত্ত এইভাবে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্র কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় সারা তুনিয়ার শান্তিকামী জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। 'ভিটো' ক্ষমতার যদি অবসান ঘটে, আজ আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি কি রূপ নেবে বোঝা কঠিন নয়। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ইংলণ্ডই মাত্র বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সক্ষম; এবং যুদ্ধ যদি হয়, তবে এই তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যেই হবে। আজ তাই

বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করতে হ'লে ত্রিশক্তির ঐক্য অপরিহার্য্য। ভিটো প্রথার বিরোধিতা ক'রে মার্কিন সরকার শুধু যে তার অঙ্গীকারেরই খেলাপ করছে তা নয়, পরাজিত ফ্যাশিজ্‌মের পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষা জয়যুক্ত করতে চলেছে।

ভিটো প্রথা তুলে দেওয়ার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রের এতটা আগ্রহ বুঝতে হ'লে, গোড়ার কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। জাতিসঙ্ঘের ৫৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, নিউজিল্যাণ্ড, ইজিপ্ট, ইরাক, সৌদি-আরব, ফিলিপাইন, ব্রেজিল, কিউবা, মেক্সিকো, পানামা, আর্জে-ণ্টাইন, কলোম্বিয়া প্রভৃতি ত্রিশটির অধিক রাষ্ট্র বৃটেন এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের তল্পীদার। নিরাপত্তা পরিষদের ১২টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রের সংখ্যা নয়টি। ভিটো ক্ষমতার পরিবর্ত্তে আজ যদি সাধারণ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হয়, তবে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় অনায়াসে তাদের তল্পীবাহকদের ভোট একত্র ক'রে যে-কোনও সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতে পারবে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই বারুচ-পরিকল্পনায় ভিটো ক্ষমতা তুলে দেবার দাবী জানানো হ'য়েছে। ভিটো ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে অর্থাৎ সোভিয়েটের কণ্ঠরোধ ক'রে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের পক্ষে তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে আণবিক শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহার করা সহজ হ'য়ে পড়বে।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রদ্বয়ের চক্রান্ত আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে প্যারিস সম্মেলনে ভোটগ্রহণের পদ্ধতির উপর আলোচনার সময়। প্যারিসে পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকে প্রথমে স্থির হয় যে, সন্ধিশর্ত্তের খসড়া সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন শান্তি সম্মেলনে ভোট গৃহীত হবে, তখন সরল সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিবর্ত্তে দুই

তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অতীতেও বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে আলোচনার সময় দুই-তৃতীয় অথবা তিন-চতুর্থ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই নীতির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা অসম্ভব। আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যতদূর সম্ভব মতৈক্য গড়ে তোলা অপরিহার্য্য। পূর্ণ মতৈক্যই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে স্বভাবতই অজস্র রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত থাকায় প্রত্যেক প্রশ্নে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব নয়। সেইজন্যে এই সকল ব্যাপারে দুই-তৃতীয় অথবা তিন-চতুর্থ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার রীতিই প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এই সমস্ত বিবেচনা ক'রেই পররাষ্ট্রসচিবগণ দুই-তৃতীয় ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মত দেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শান্তি সম্মেলনের কার্য্য-নির্দ্ধারক কমিশন পররাষ্ট্রসচিবগণের এই স্থির গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে সহসা সম্পূর্ণভাবে বাতিল ক'রে দিয়ে সরল সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেই সম্মতি দিয়ে বসে; এবং তা' সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনের অনুমোদন লাভ করে। মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অকস্মাৎ তাঁরা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে-সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেন। আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতির ইতিহাসে বৃহৎ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অঙ্গীকার ভঙ্গের এমন চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। এর আসল উদ্দেশ্য অবশ্য সম্মেলনে বিতর্কের সময়েই ধরা পড়ে যায়। দেখা গেল সম্মেলনে আমন্ত্রিত একুশটি রাষ্ট্রের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় তাদের তাঁবেদারদের নিয়ে বারো অথবা তেরটি ভোট সংগ্রহ করতে সক্ষম। চৌদ্দটি ভোট সম্বন্ধে তারা কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত নয়। অথচ কমপক্ষে চৌদ্দটি ভোট সংগ্রহ করতে না পারলে

দুই-তৃতীয় ভোটাধিক্য অর্জ্জন করা অসম্ভব। এই জন্যেই বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র শেষে সাধারণ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করতে থাকে, কারণ তাঁবেদারদের একত্র ক'রে এগারটা ভোট জোগাড় করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ। ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের যূপকাষ্ঠে এইভাবে শান্তি সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য বলি দেওয়া হ'ল। সম্মেলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন ভাবে পূর্ব্বতন শত্রু-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সন্ধিপত্র রচনা করা যাতে ক'রে সে-সব দেশে ফ্যাশিজ্‌মের শেষ চিহ্নও লোপ ক'রে দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিসমূহ তাদের ভোটের জোরে এমন গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী যা শান্তি সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড ক'রে তুললো।

পরাজিত শত্রু রাষ্ট্রদের সঙ্গে ব্যবহারের প্রশ্নে শান্তি সম্মেলন স্পষ্টত দুইটি ভাগে বিভক্ত হ'যে পড়ে। একদিকে দেখা গেল সোভিয়েট ইউনিয়ন পট্‌স্‌ডাম সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রয়োগের পক্ষপাতী, অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিসমূহের আসল দৃষ্টি রইল কিভাবে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সে-সব দেশে আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক শৃঙ্খল বিস্তৃত করা চলে। মিত্রপক্ষের সম্পত্তি নষ্ট করবার অপরাধে যখন ভূতপূর্ব্ব শত্রুরাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন ওঠে, তখন সোভিয়েট প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের আঘাতে পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত, এমন অবস্থায় সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণই দাবী করা উচিত যা তারা দিতে সক্ষম। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্ষতিপূরণের সমস্তটাই দাবী ক'রে বসেন। ইতালীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় প্রসঙ্গে সোভিয়েটের দাবী ছিল দশ কোটি ডলার। এই অর্থ সাত বৎসরের মধ্যে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়; ইতালীর আর্থিক

বনিয়াদ যাতে এই আঘাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্যে রুশিয়া থেকে কাঁচামাল সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ইতালীর উপর এমন কতকগুলি অসঙ্গত দাবী জানায় যার একমাত্র উদ্দেশ্য ইতালীর অর্থনীতিকে দীর্ঘদিনের জন্যে নিজেদের করায়ত্ত করা। রুমানিয়ার কাছেও এমন ক্ষতিপূরণ চাওয়া হ'ল যা' তার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তখন রুমানিয়ার তৈলশিল্পে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব দাবী করা হয়। এ ছাড়া শান্তি সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় বল্কান এবং ইতালীতে সকলের সমান অধিকার দাবী করে। এর উদ্দেশ্য অবশ্য খুবই স্পষ্ট। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াতে যদি সকলের সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়, তবে মার্কিন মূলধন অতি সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সমুদয় শিল্পশক্তি কিনে নেবে, কারণ এই সব ছোট ছোট দেশগুলির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা অসম্ভব। এর ফলে বল্কানে ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা সহজ হ'য়ে পড়বে। দানিয়ুব জলপথে সকলের সমান অধিকার দাবী অবশ্য ঐ একই উদ্দেশ্যেই করা হয়।

শান্তি সম্মেলনে একথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য পরাজিত রাষ্ট্রগুলিতে আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক অধিকার বিস্তৃত করা। শত্রুরাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গেই যে এদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট, সেকথাও স্পষ্টই ধরা পড়ে। ইতালী এবং অস্ট্রিয়ার রক্ষণশীল দলগুলির সঙ্গেই মাথামাখি বেশী দেখা যায়। রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ায় গণ-সমর্থিত সরকারকে অস্বীকার ক'রে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গেই সখ্য নিবিড় হ'য়ে ওঠে। পোলাণ্ড ও যুগোস্লাভিয়ার বেলায়ও সেই একই কথা খাটে।

জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় আলোচনাতেও ইঙ্গ-মার্কিন এবং

সোভিয়েট নীতির পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়ে। পট্‌স্‌ডাম বৈঠকে স্থির হয় যে, জার্মানীতে নাৎসীবাদের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত উৎখাত করা হবে। কিন্তু তারপর এতদিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে সহস্র সহস্র জার্মান সৈন্য রক্ষী হিসাবে বর্ত্তমান রয়েছে, নাৎসি নায়কদের অনেককে দায়িত্বশীল সরকারী পদে নিয়োগ করা হচ্ছে, জার্মান পুঁজিপতিরা আবার তাদের কলকারখানা ফেরত পাচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতা অস্বীকৃত র'য়ে গেছে। একমাত্র সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলেই নাৎসিবাদ নির্ম্মূল হ'তে চ'লেছে বলা চলে। সেখানে জার্মান জঙ্গীবাদের প্রধান আশ্রয় প্রাশিয়ার জাঙ্কারদের বিরাট জমিদারী কৃষকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হচ্ছে।

পট্‌স্‌ডাম সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা দূরে থাকুক, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় জার্মানীতে নাৎসিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে। পট্‌স্‌ডামে চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হয় যে, একমাত্র ফ্যাশিজ্‌মের উচ্ছেদের পরই সমস্ত অঞ্চলগুলি একত্র ক'রে নয়া জার্মানীর আর্থিক বনিয়াদ সুগঠিত করা হবে। কিন্তু সম্প্রতি আর্থিক উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জার্মানীর বৃটিশ ও মার্কিন এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে একত্র করবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়েছে। এই একত্রীকরণের আসল উদ্দেশ্য যে শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিম জার্মানীকে ইঙ্গ-মার্কিন মূলধনের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে বেষ্টন করা, মস্কো বৈঠকে তা পরিষ্কার প্রকাশ পায়। মস্কোতে পররাষ্ট্রসচিব-সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক জার্মানী প্রতিষ্ঠাকল্পে সোভিয়েট প্রতিনিধি আট দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ইঙ্গ-মার্কিন শোষণের পক্ষে অনুকূল নয় বুঝতে পেরে মার্কিন প্রতিনিধি জার্মানীকে ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করবার দাবী জানান। এই দাবীর একমাত্র উদ্দেশ্য পূর্ব্বের শোষণমুক্ত

এলাকা থেকে পশ্চিম জার্মানীকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ক'রে সেখানকার আশ্রিত ফ্যাশিস্তদের সহযোগিতায় ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রসারলিপ্সা ত্রিশক্তি-সহযোগিতার সঙ্কল্পকে ক্রমশ সঙ্কটের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্নেই যে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এক সোভিয়েট-বিরোধী ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছে উপরের আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ ক'রেই এরা ক্ষান্ত নয়। বিশ্বের মানচিত্রের প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই চোখে পড়ে যে, সারা দুনিয়া আজ এক ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের দ্বারা বেষ্টিত হ'তে চলেছে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণে ব্যস্ত। এর উদ্দেশ্য প্রথমত সমগ্র পৃথিবীকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রসারোন্মুখ ধনতন্ত্রকে অধিকতর বিস্তার লাভের সুযোগ দেওয়া এবং বৃটেনের কবলিত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জ্জাতিক গণ-আন্দোলন দমন এবং সোভিয়েট রুশিয়ার শক্তি হ্রাস ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সজ্জার দ্বিতীয় লক্ষ্য। ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা যাতে প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হ'য়ে সোভিয়েট-বিরোধী ফ্রণ্টকে দুর্ব্বল ক'রে না তুলতে পারে তার জন্যেই ইঙ্গ-মার্কিন ঐক্যের উপর এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে। 'পশ্চিমী গণতন্ত্র' কথাটার উপর এতটা গুরুত্ব আরোপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাপা দেবার চেষ্টা।

নিকট এবং মধ্য প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের কাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ইওরোপের চেহারা যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হ'তে চ'লেছে তাতে খাস মহাদেশ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে

আক্রমণ করা আজ অসম্ভব। মধ্য এবং নিকট প্রাচ্যের মুক্তি-আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এ-অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাজ্যবাদী স্বার্থ গ'ড়ে তুলছে। ইতিমধ্যেই এ-এলাকায় অজস্র বিদেশী সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মিত হ'য়েছে, মার্কিন মুনাফাশিকারীরা এ-অঞ্চলের তৈলখনিগুলিতে শোষণব্যবস্থা বিস্তৃততর করে চ'লেছে, সোভিয়েট রুশিয়াকে এদিক থেকে বেষ্টন করবার আয়োজন শুরু হ'য়ে গেছে। এ-অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে প্যালেস্টাইন রিপোর্টে। আরব এবং ইহুদীরা যাতে একত্র হ'য়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মিলিত গণ-আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে না পারে, তার জন্যে এক ঘৃণিত বিভেদ-নীতির অনুসরণ করা হচ্ছে। এক লক্ষ ইহুদিকে প্যালেস্টাইনে আনয়নের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরবেরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। আরব-ইহুদি সম্পর্ককে আরও জটিল ক'রে সাম্রাজ্যবাদী আসন প্যালেস্টাইনে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা চলেছে। ইরানের বামপন্থী আন্দোলনকেও সাধ্যমতো বাধা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনকে দাবিয়ে রেখে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এই বিরাট এলাকা জুড়ে এক শক্তিশালী সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্ত গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস পাচ্ছে। ভারতবর্ষকেও এর ভেতর টেনে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে।

আফ্রিকায় ইতিপূর্ব্বে মার্কিন নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৃটিশ-বিরোধিতা। ইঙ্গ-ইতালীয় স্বার্থকে দুর্ব্বল ক'রে আফ্রিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পথ উন্মুক্ত করাই তৎকালীন আমেরিকান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক গঠনের পর

থেকেই এ-অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ স্বার্থ সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হ'য়ে উঠেছে। এর পরিবর্ত্তে অবশ্য জার্মানীতে এবং সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছে।

ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষরিত হ'য়েছে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে সরকারী ভাবে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-বাহিনীর মধ্যে সামরিক চুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার সামরিক বিমান-বাহিনী এবং বৃটেনের রাজকীয় বিমানবাহিনী যুদ্ধের সময়কার স্টাফ, কৌশল ও গবেষণামূলক সহযোগিতাকে শান্তির সময়েও রক্ষা করবার জন্যে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে।

এইভাবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, দিকে দিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আন্তর্জ্জাতিক গণ-আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব রোধ করবার প্রেরণায় বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এক প্রতিক্রিয়াশীল 'ব্লক' খাড়া ক'রে তুলেছে। সারা পৃথিবীর যুদ্ধক্লান্ত জনগণের মনে আবার যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, তার একমাত্র কারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা। অথচ দুনিয়া-জোড়া রক্ষণশীল একচেটিয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি এদের অধীনে থাকায় সহজেই এরা বিশ্বের জনগণের এক বৃহৎ অংশকে প্রতারিত করতে সক্ষম হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব্ব ইওরোপের নূতন রাষ্ট্রগুলিকে 'টোট্যালিটারিয়ানিজ্‌ম' আখ্যা দিয়ে এবং নিজেদেরকে 'গণতান্ত্রিক' ব'লে ঢাক পিটিয়ে এরা সারা পৃথিবীকে বিভ্রান্ত ক'রে রাখতে চায়। দুনিয়ার কোটি কোটি শোষিত নরনারী যাদের সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির জন্যে আজ চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা যে-গণতন্ত্রের শ্লাঘায় মুখর, তার আসল চেহারার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা আবশ্যক। সেই সঙ্গে রক্ষণশীল

প্রচারের বিষবাষ্প অপসারিত ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব্ব ইওরোপের নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির খাঁটি রূপ পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আজ কোথায়, তা আরও ভালো ভাবে বুঝতে হ'লে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

গণতন্ত্রের ঐতিহ্য

বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম। ধনিক স্বার্থের তাগিদেই একদিন গণতান্ত্রিক আদর্শের আবির্ভাব অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের প্রয়োজনে যে-ভাবধারার জন্মলাভ ঘটে, বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে সেই গণতান্ত্রিক আদর্শ আজ এমন এক পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন তার সার্থক পরিণতির জন্যে ধনতন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ প্রয়োজন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ এই অন্তর্বিরোধই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মূল প্রেরণা।

সামন্ততন্ত্র এবং কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির বিরুদ্ধে ধনিকেরা যখন নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পূর্ণ বিকাশের জন্যে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রাম শুরু করে, বুর্জোয়া চিন্তাজগতে তখন বণিকস্বার্থের অনুকূল আদর্শ দেখা দেয়। মার্কেন্টাইলিস্ট নীতির অসংখ্য বিধি-নিষেধের প্রাচীর ধনিকদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ ক'রেছিল। অথচ প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের জোরে বিপুল আর্থিক ক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর হস্তগত হওয়ায় সে-যুগে সমাজের উৎপাদন-শক্তির লক্ষ্যণীয় প্রসার ঘটে। পুরাতন ফিউডাল আর্থিক কাঠামোর মধ্যে নূতন উৎপাদন-শক্তির বিকাশ তখন স্পষ্টই অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাধাহীন বিস্তারের জন্যে ধনিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার সেদিন তাই সামাজিক বিবর্ত্তনের প্রেরণাতেই অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ল।

সতের এবং আঠার শতকের বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের প্রচারিত নূতন আদর্শ আসলে ধনিক স্বার্থকেই রূপায়িত ক'রে তোলে। অর্থনীতিতে 'অবাধ নীতি', রাজনীতিতে 'জনগণের সার্ব্বভৌমত্ব' এবং ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের জগতে 'যুক্তির শাসন'—এই সব তত্ত্বের আবির্ভাব ধনিকদের প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত ক'রে আনে। কিন্তু সেদিনের নূতন আদর্শ জনসাধারণকেও স্পষ্টই আকর্ষণ করে। ফিউডাল শোষণে জর্জ্জর কৃষকশ্রেণীর মনে এই গণতান্ত্রিক ভাবধারা আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক মুক্তির আশা জাগিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসঙ্গে 'ফিজিওক্র্যাটদের' দাবী ফরাসী কৃষককে পিছনে টেনে আনে, কারণ জমির উপর অধিকার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা কৃষকদের তখন প্রচণ্ড। এই ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সামাজিক ও আর্থিক অসন্তোষ সংগঠিত ক'রে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের রাষ্ট্রিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

জনসাধারণের সাহায্যেই যদিও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংসাধিত হয়, বিপ্লবের ফসল থেকে কিন্তু এদের স্পষ্টই বঞ্চিত করা হ'ল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফিউডাল এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের শোষণ থেকে জনগণ মুক্তি পেল বটে, জমিতে কৃষকের অধিকারও স্বীকৃত হয়। অভিজাত এবং সাধারণ লোকের মধ্যে আইনগত প্রভেদের বিলুপ্তি বুর্জোয়া বিপ্লবেরই দান। কিন্তু এ সত্ত্বেও জনগণের ভাগ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর অবাধ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, কলকারখানার বাধাহীন বিস্তার এবং অর্থবিনিয়োগের নূতন নূতন পথ খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকালীন গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করবার আগ্রহ ধনিকদের স্পষ্টই কমে এল। ফরাসী বিপ্লবের বেলায় এই অবস্থা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। বৃটেনে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রথম শাসনতন্ত্রে ভোটের অধিকার বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, কারণ সম্পত্তির

অধিকারী না হ'লে নাকি রাষ্ট্রিক দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয় না। নেপোলিয়নের আমলে প্রণীত ফ্রান্সের বিখ্যাত আইনাবলীর সাহায্যে অভিজাত সম্পত্তির পরিবর্ত্তে বুর্জোয়া সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নিক কোডের প্রায় দুই হাজার অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্র সাতটি শ্রমিক-সমস্যা বিষয়ক; প্রায় আট শত অনুচ্ছেদ সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে রচিত। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়া অথবা ধর্ম্মঘট করা বে-আইনী সাব্যস্ত হয়; মজুরী নির্দ্ধারণের ব্যাপারে মালিকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ব'লে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল।

বিপ্লবকে বেশী দূর এগিয়ে যেতে দিলে জনসাধারণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবারই সম্ভাবনা, এই ভয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী রিপাব্লিকের আদর্শ থেকেও স্পষ্টই স'রে আসে। অবাধ রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মাঝামাঝি অবস্থাতেই ধনিক স্বার্থের পূর্ণ সংরক্ষণ সম্ভব কল্পনা ক'রে এরা সীমাবদ্ধ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে উঠল। বৃটেনে স্বেচ্ছাচারী স্টুয়ার্ট রাজাদের হাত থেকে রাষ্ট্রিক অধিকার কেড়ে এনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপন করা হয়। ফ্রান্সে ১৮৩০-এর জুলাই-বিপ্লবের পর বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই। প্রাশিয়া এবং ইতালীতেও ধনিকেরা নূতন রাজতন্ত্রের সমর্থক হ'য়ে ওঠে।

ধনিক শ্রেণী যখন স্পষ্টই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ থেকে পিছিয়ে এল, তখন বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব জনসাধারণের উপর এসে পড়ে। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে যদিও আইনগত সাম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে, কাজের সময় কিন্তু দেখা গেল যে আইন সম্পত্তিবানদেরই পক্ষে, আইন প্রণয়নে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিতই থেকে যায়। সাধারণের কাছে তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, নিজেদের স্বার্থের অনুকূল আইন পাস করতে হ'লে আইনসভার নির্ব্বাচনে তাদের কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রিক অধিকারের দাবী এইভাবেই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন দল নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিল। নানা কারণে জ্যাকোবিন-শাসন অল্পস্থায়ী হ'লেও এদের চিন্তাধারা দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে। অবশেষে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-বিপ্লবের পর ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার পূর্ণ-বয়স্কের ভোটাধিকার মেনে নিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রীয় অধিকার এইভাবে অল্পসংখ্যক সম্পত্তিবানদের হাত থেকে নব্বুই লক্ষ ভোটদাতার হাতে এসে পড়ে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চার্টিস্ট আন্দোলনের মূল দাবী ছিল জনগণের রাষ্ট্রিক ভোগের অধিকার। ১৮৩২-এর রিফর্ম্ স্ বৃটেনের জনসাধারণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিতই রাখে। ১৮৩৬ সালে র‍্যাডিকাল নেতা লভেট প্রণীত 'দি রট্‌ন্ হাউস অফ্ কমন্স্' পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, ৬,০২৩,৭৫২ জন বয়স্ক পুরুষের মধ্যে ৮৩৯, ৫১৯ জনকে মাত্র ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হ'য়। ১৮৩৮ সালে পার্লামেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্রে র‍্যাডিকালদের যে-সকল দাবী পেশ করা হয় তার মধ্যে পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার, বাৎসরিক আইনসভা নির্ব্বাচন, গোপনীয় ব্যালটে ভোটদানপ্রথা, আইনসভার সদস্যদের বেতনের ব্যবস্থা ও সম্পত্তিগত যোগ্যতার উচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য। যদিও নানা কারণে ১৮৪৮ সালে এই আন্দোলন ভেঙ্গে পড়ে, চার্টিস্টদের দাবীকে কিন্তু খুব বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ১৮৬৭ সালে বৃটেনে শ্রমিকদের এক অংশ ভোটদানের ক্ষমতা লাভ করে। ধীরে ধীরে বাৎসরিক নির্বাচনের দাবী ছাড়া চার্টিস্টদের প্রধান দাবীগুলির প্রায় সমস্তই মেনে নিতে হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই জনসাধারণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক সাম্যের অসারতাও উপলব্ধি করতে পেরেছে। চার বছর বা পাঁচ বছর অন্তর আইনসভার নির্ব্বাচনে একটা ভোট দিয়ে যে নিজেদের অধিকার কায়েম করা অসম্ভব,

এ-ধারণা জনগণের মনে ক্রমশ দৃঢ় হ'তে থাকে। জনগণ সহজেই বুঝতে পারে যে, আর্থিক ক্ষমতা ধনিকদের করায়ত্ত থাকায় রাষ্ট্রিক অধিকার পেয়েও জনগণ নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন করতে অক্ষম। ক্ষুধার্ত্তের কাছে ভোটের মূল্য সত্যই কতটুকু? ধনিকেরা অনায়াসেই জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। এই সহজ উপলব্ধি গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং আন্দোলনের পরিধিকে বিস্তৃততর ক'রে তোলে। রাষ্ট্রিক সাম্যের পরিবর্ত্তে আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই এখন থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ এই সময় থেকেই।

শিল্পবিপ্লবের সূচনাতেই একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চোখে নূতন বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির গলদ ধরা পড়ে। সামাজিক ধনবৈষম্য সম্পর্কে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের ন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে জেরেমি বেন্থাম, জেম্‌স্‌ মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি সংস্কারকেরা আন্দোলন শুরু করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনও সঙ্কল্প এঁদের ছিল না, কারণ আসলে এই সব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তানায়কেরা ধনিক-সমাজেরই প্রতিনিধি। সাধারণ 'ন্যায়সঙ্গত' সংস্কারের সাহায্যে এঁরা পুঁজিবাদের ত্রুটি দূরীকরণে প্রয়াসী ছিলেন।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ ক্রমশই ফুটে বেরুতে থাকে, তখন সংস্কারপন্থীদের স্থানে নূতন সোশালিস্ট বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন এবং ফ্রান্সের সেণ্ট সাইমন ও ফুরিয়ারকে সোশালিস্ট আদর্শ পরিস্ফুট করার কাজে পথ-প্রদর্শক বলা চলে। পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও এঁদের চিন্তাধারার মূল কথা বর্ত্তমান আর্থিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নূতন

সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ক'রে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নির্দ্দেশও এঁদের অনেকের রচনাতেই ফুটে ওঠে। কিন্তু সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকায় কোন্ পথে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব সম্ভব সে-সম্পর্কে এঁরা কোনও স্থির সন্ধান দিতে পারেননি। যুক্তবাদী ফরাসী পণ্ডিতদের মত এঁদেরও বিশ্বাস ছিল যে, প্রচারের সাহায্যে ধনিকের মন ভিজিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই সমাজের পরিবর্ত্তনের জন্যে ধনীর মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া এঁদের গত্যন্তর ছিল না। সমাজবাদী পণ্ডিত ফুরিয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর আদর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্যে আর্থিক সাহায্য করতে ধনিকরা প্রকৃতই উদ্গ্রীব। শোনা যায়, বছরের পর বছর তিনি নিয়মিত প্রতি মধ্যাহ্নে সাহায্যকারী ধনীর প্রতীক্ষায় নিজের ঘরে ব'সে থাকতেন ! সম্পত্তিবান শ্রেণীর ন্যায়বিচারের উপর এতটা গভীর বিশ্বাস থাকবার ফলে শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে প্রথম সোশালিস্টরা স্পষ্টই উদাসীন ছিলেন। চোখের সামনে নিজের অবাস্তব পরিকল্পনা খান্খান্ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়তে দেখেও রবার্ট ওয়েনের চৈতন্যোদয় হ'ল না। চার্টিস্ট আন্দোলনের দিকে পিছন ফিরে তিনি ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নে মগ্ন হ'য়ে রইলেন !

অথচ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছিল। মালিকের অসহ্য জুলুমের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াবার জন্যে মজুরেরা এই সময় থেকেই তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। বৃটেনের শাসক সম্প্রদায় 'কম্বিনেশন্স্ এ্যাক্টস্'-এর সাহায্যে শ্রমিকদের সভা-সমিতি বা আলোচনা নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু সংগ্রামশীল শ্রমিক শ্রেণীকে আইনের জোরে নিরস্ত করা অসম্ভব। মজুরেরা গোপনে সংগঠিত হবার চেষ্টা করে, কখনও বা কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে

ফেলে, মালিকের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন ক'রে তোলে। অবশেষে বাধ্য হ'য়ে ১৮২৫ সালে বৃটেনে সংগঠনী বাধানিষেধ শিথিল ক'রে দিতে হ'ল। ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বত্রই এ-যুগে শ্রমিক-সংগঠনবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে মজুরদের বিরামহীন সংগ্রাম চোখে পড়ে। তথাপি এ-সময়ে শ্রমিক-আন্দোলন তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারছিল না। তার কারণ অবশ্য মজুরদের বিপ্লবী শক্তির অভাব নয়, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার অনুপস্থিতি। বিপ্লবী আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হ'লে যে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রয়োজন, শ্রমিকেরা তার সন্ধান তখনও পায়নি।

সোশালিস্ট আদর্শ এবং শ্রমিক-সংগ্রামের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে উনিশ শতকের মধ্য ভাগে কার্ল মার্ক্‌স্ এবং তাঁর আজীবন বন্ধু ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখে এক স্থির বিপ্লবী কর্ম্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। তাঁদেরই নির্দ্দেশে গণ-আন্দোলন আর্থিক মুক্তির সার্থক পথ খুঁজে পেল। এদিক থেকে মার্ক্‌স্‌বাদকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক অনুবৃত্তি বলা চলে। কল্পনাবিলাসী প্রথম সোশালিস্টরা যখন সমাজের পরিবর্ত্তনের জন্যে ধনীদের মুখের দিকে চেয়ে দিন গুনছিলেন, তখন মার্ক্‌স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলেন যে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে ধনিকের আগ্রহ আশ করা বাতুলতা মাত্র, কারণ এ-ব্যবস্থায় একমাত্র তারাই সন্তুষ্ট। তাই তাঁর মনে হলো যে, পরিবর্ত্তন আসতে পারে একমাত্র তাদেরই চেষ্টায় বর্ত্তমান সমাজের উচ্ছিষ্টে যারা বর্দ্ধিত। ধনতান্ত্রিক সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নির্য্যাতিত শ্রেণী শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যমেই যে জনগণের আর্থিক মুক্তি সম্ভব, মার্ক্‌সের নিপুণ বিশ্লেষণেই তা প্রথম ধরা পড়ে। সামাজিক ক্রমবিকাশের মূল সূত্র আবিষ্কার ক'রে মার্ক্‌স্ দেখালেন যে, ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি বর্ত্তমানে শ্রমিক-বিপ্লবেরই দিকে। মার্ক্‌সের মতে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত

প্রেরণাতেই শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে শ্রেণীহীন নূতন সমাজ গ'ড়ে তুলবে, এবং তখনই পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। মার্ক্‌স্‌বাদ জনগণের মনে স্পষ্টই আত্মবিশ্বাস এনে দিল। প্রকৃত গণ-আন্দোলনের এখন থেকে মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সমাজতন্ত্র স্থাপন।

গত দেড়শ' বছরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছে। আইনগত সাম্য অথবা রাষ্ট্রিক সমান অধিকার জনগণের মৌলিক দাবী পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। আজ তাই মার্ক্‌স্‌পন্থীদের নেতৃত্বে দেশে দেশে গণ-আন্দোলন বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Marxism and the Democratic Tradition—A. Landy

ইতিহাসের ধারা—অমিত সেন

বৃটিশ গণতন্ত্রের স্বরূপ

বৃটেনের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার সকলের উপর তলায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম গোষ্ঠিতে পড়ে বড় বড় পুঁজিপতি ধনিকেরা। লোহা ইস্পাত বিদ্যুত কয়লা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি জাতীয় উৎপাদনের মূল শিল্পগুলি এদের করায়ত্ত। বড় বড় 'ট্রাস্ট' ও 'কম্বাইন' প্রভৃতি একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এরা সংগঠিত। কোনও বিশেষ শিল্প অথবা দেশের মধ্যে এদের স্বার্থ সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন দেশে এদের স্বার্থ বিস্তৃত দেখা যায়। বড় বড় ব্যাঙ্ক-মালিকদের দ্বিতীয় গোষ্ঠিতে ফেলা চলে। আসলে এরা উল্লিখিত একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, বৃটেনের প্রধান পাঁচটি ব্যাঙ্ক এবং বড় বড় বীমা কোম্পানীতে এদের স্বার্থ সংরক্ষিত। প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীরা তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের ৭৭ জন পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি, অর্থাৎ বৃটেনের মোট জাতীয় ভুমির শতকরা তিন ভাগ দখল ক'রে রয়েছে। বড় বড় শিল্পের সঙ্গেও এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান।

এই ত্রিগোষ্ঠীর উপর ভর ক'রে বৃটেনে একচেটিয়া পুঁজিবাদ খাড়া হয়ে আছে। এদেরই হাতে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠি; এই অল্পসংখ্যক একচেটিয়া মুনাফাখোরদের স্বার্থের তাগিদেই বৃটেনের পক্ষে আজ জগৎ জোড়া সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। এরা সংখ্যায় আট হাজারের

কিছুটা বেশী ; এদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় দশ হাজার পাউণ্ডের উপর। ১৯৪১-৪২ সালে আয়কর সমেত এদের উপার্জ্জন সতেরো কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

এর পরের ধাপে যে-সব বিত্তবানের দেখা মেলে তাদের আয় উল্লিখিত ধনিকদের সমান না হ'লেও প্রায় কাছাকাছি। এদের যথাযথ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে বার্ষিক দু' হাজার পাউণ্ডের উপর আয় এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা সব মিলিয়ে বৃটেনে প্রায় এক লাখ। এদের মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী ছাড়া তাদেরও সাক্ষাৎ মেলে আসলে হয়তো যারা বিরাট সম্পত্তিবান নয়, কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার থেকে অথবা সিভিল সার্ভিস, সমর বিভাগ, আইন ব্যবসায় বা চার্চ থেকে যাদের আয় বিস্তর।

উপর তলাকার মুষ্টিমেয় পরিবারের আর্থিক আয়ের সঙ্গে যখন নীচের বিরাট জনসমুদ্রের উপার্জ্জনের তুলনা করা যায়, তখনই বৃটিশ 'গণতন্ত্রের' আসল রূপ ফুটে ওঠে। বর্ত্তমানে বৃটেনের চার লক্ষ বেকারের কথা বাদ দিলেও কোটি কোটি শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ সত্যিই কতটুকু আর্থিক সচ্ছলতা ভোগ করছে, ধনিকের মুনাফাস্ফীতির তুলনায় শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির গতি কত মন্থর, যুদ্ধকালের অবস্থা থেকেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ১৯৩৮-৪৫ সালে জাতীয় মজুরি তহবিল বেড়েছে শতকরা ৬১ ভাগ (যদিও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ); আর সে-তুলনায় মালিকের মুনাফার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৮৬ ভাগ। যুদ্ধের মধ্যে অধিক খাটুনি, জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ে বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা দ্রুত হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছে। ১৯৪৫-এর জুলাই থেকে ১৯৪৬

সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত কয়েক মাসে উৎপাদন-শিল্পে পুরুষ শ্রমিকের সাপ্তাহিক আয় কমেছে সাত শিলিংয়ের উপর আর মেয়ে শ্রমিকের তিন শিলিংয়ের বেশী। বর্ত্তমানে বৃটেনের একজন কৃষি-শ্রমিকের সাপ্তাহিক গড় আয় ৪ পাউণ্ড, পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সাড়ে তিন পাউণ্ড, আর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মেয়ে মজুরের ২ পাউণ্ড ১৮ শিলিং। ১৯৩৫ সালে সার জন অর-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে 'গণতান্ত্রিক' বৃটেনের অর্দ্ধেক অধিবাসী আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে স্বাস্থ্যধারণের উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণে অক্ষম। গত দশ বছরে এ অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না।

সারা বৃটেনের আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক ভাগ্য যে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকের কবলে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে এইচ. ক্যাম্পিয়নের 'পাব্লিক এ্যাণ্ড প্রাইভেট প্রপার্টি ইন গ্রেট বৃটেন' গ্রন্থে। ক্যাম্পিয়নের পুস্তক থেকে জানা যায় যে, ইংলণ্ডের পূর্ণবয়স্ক জনসমষ্টির শতকরা সাত জন সমুদয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির শতকরা ৮৫ ভাগের মালিক। তাঁর হিসাবে ১৯৩৬ সালে বৃটেনের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ছিল ১৫৮৫ কোটি পাউণ্ড থেকে ১৭৫৫ কোটি পাউণ্ড। এর মধ্যে ১৪৬০ কোটি পাউণ্ড থেকে ১৪৬১ কোটি পাউণ্ড ছিল ১,৭২৭,০০০ থেকে ১,৮৭৪,০০০ জন ভাগ্যবানের দখলে। এদের প্রত্যেকেই কিন্তু ১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের সম্পত্তির মালিক ছিল। অথচ এদের সংখ্যা সমগ্র দেশের পঁচিশোত্তীর্ণ জনসমষ্টির শতকরা ৬·৮ থেকে ৭·৪-এর মধ্যে। ক্যাম্পিয়নের হিসাবকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না, কারণ উইলিয়াম বেভারিজের প্রদত্ত সংখ্যাও অনুরূপ। দু'জনার হিসাবের গড় থেকে দেখা যায় যে, পূর্ণবয়স্ক জনসমষ্টির শতকরা ৭·১ জন বৃটেনের সমুদয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির শতকরা ৮৪·৫ ভাগের মালিক। লক্ষ্যণীয়

এই যে, এই শতকরা ৭·১ জনের মধ্যে তাদেরও ধরা হ'য়েছে যাদের সম্পত্তির মূল্য মাত্র ১,০০০ পাউণ্ড। হিসাবে জানা যায় যে, বৃটেনের শতকরা এক জন সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির শতকরা ৫৫·৮ ভাগের মালিক। এর পরও বৃটিশ 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ?

প্রেস ও বেতার প্রতিষ্ঠান আধুনিক যুগে জনমত গঠনে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ; কিন্তু বৃটিশ সংবাদপত্র ও বেতার প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিদেব দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে এর মারফৎ ধনিক-বিরোধী গণ-স্বার্থের প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৃটেনের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-মালিকদের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'টাইম্‌স্' ও 'সানডে অবজার্ভার' নামক দুটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক এ্যাস্টর পরিবার, ব্যাঙ্ক জগতে এদের খ্যাতি সুবিস্তৃত। কয়লা এবং গুরুশিল্পের মালিক বেরী ভ্রাতৃবৃন্দ 'ডেইলী টেলিগ্রাফ', 'সানডে টাইম্‌স্', 'ডেইলী স্কেচ', 'ওয়েস্টার্ন মেল' এবং আরও কয়েকটি নামজাদা কাগজের স্বত্বাধিকারী। 'ডেইলি মেল,' 'ইভনিং নিউজ', 'সানডে ডেসপ্যাচ' প্রভৃতি সংবাদপত্র রদারমিয়ার পরিবারের দখলে। লর্ড বিভারব্রুক 'ডেইলী এক্সপ্রেস', 'সানডে এক্সপ্রেস' এবং 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর মালিক। কোকো এবং চকোলেট ব্যবসায় জগতে সুপরিচিত ক্যাডবেরী-পরিবার 'নিউজ ক্রনিকল' এবং 'স্টার' কাগজ পরিচালনা করেন। সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত 'ডেইলী ওয়ার্কার' ছাড়া বৃটেনে আর এমন কোনো দৈনিক সংবাদপত্র নাই যাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিনিধি বলা চলে। জর্জ ল্যান্সবেরী 'ডেইলী হেরাল্ড'কে খাঁটি শ্রমিক-মুখপত্রে পরিণত করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। অবশেষে ওধাম পরিবারের 'দাক্ষিণ্যে' ২০ লক্ষ পাউণ্ড নিয়োগ ক'রে একে ফাঁপিয়ে তোলা হয়। বৃটিশ সোশালিস্টদের দৈনিক 'ডেইলী হেরাল্ড' আজও মালিকদের স্বার্থেই

চলে! এখন বোঝা সহজ যে, বৃটিশ প্রেসের 'স্বাধীনতা'র আসল অর্থ ধনতান্ত্রিক স্বার্থের স্বাধীনতা। সাম্রাজ্যের একচেটিয়া সংবাদ ব্যবসায়ী বিরাট মালিকী প্রতিষ্ঠান 'রয়টার'-এর কল্যাণে ঔপনিবেশিক দেশগুলি পর্য্যন্ত বৃটিশ ধনিকদের স্বার্থপ্রসূত সংবাদ নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়।

বৃটেনে সংবাদপত্র ব্যবসায়ে একচেটিয়া মালিকানার দ্রুত বিস্তার লক্ষ্য করবার বিষয়। স্বাধীন পত্রিকাগুলি ক্রমশই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে আসছে। গত পঁচিশ বছরে বৃটেনে প্রাতঃকালীন সংবাদ-পত্রের শতকরা ৪৭ ভাগ এবং সান্ধ্য পত্রিকার শতকরা ২৫ ভাগ এইভাবে লোপ পেয়েছে। সংবাদপত্রে একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব আজ বৃটিশ জনসাধারণের মনে এমন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে যে, সম্প্রতি কমন্স সভার শতাধিক সভ্য এ-সম্পর্কে সরকারী তদন্তের দাবী করেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সংবাদপত্র ব্যবসায়েও আজ এই একচেটিয়া মালিকানার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি মুনাফা-শিকারীরা যেভাবে সংবাদপত্রের উপর তাঁদের একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন, তাতে সচেতন পাঠক মাত্রই আতঙ্কিত হ'যে উঠছে।

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বি-বি-সি) ইংলণ্ডের অন্যতম শক্তিশালী প্রচার-প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬-এর সাধারণ ধর্ম্মঘটের সময় বৃটেনে জাতীয় বেতারের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়ে। ফলে বলডুইন সরকারের নেতৃত্বে বি-বি-সি-তে রাষ্ট্রিক অধিকার বিস্তৃত হয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রীয়করণের আসল উদ্দেশ্য যে প্রগতিশীল বৃটেনের কণ্ঠ রোধ করা তা সহজেই বোঝা যায়। বি-বি-সি'-র প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা আজ কারও অবিদিত নয়। বৃটেনের বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ

বক্তা এবং বক্তব্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন ফ্রান্সিস উইলিয়াম্‌স্‌ লিখিত ‘প্রেস, পার্লামেণ্ট এ্যাণ্ড পিপ্‌ল্‌’ পুস্তকে তার সপ্রমাণ উল্লেখ দেখা যায়। বি-বি-সি’র পরিচালকবর্গের শ্রেণীগত পরিচয় থেকে বোঝা সহজ যে, এঁদের নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে এ-ধরনের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য। বি-বি-সি-বোর্ডের সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্যার এ্যালান পাওয়েল ‘ব্রিগ্‌স্‌ মোটর বডিস্‌’ নামক বিখ্যাত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভাইস-চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন মিলিস বেরিং ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠানের একজন ডিরেক্টর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের গভর্নর মণ্টেগু নরম্যানের ভ্রাতা যুদ্ধের পূর্ব্বে অনেকদিন বি-বি-সি-বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এঁদের নিকট থেকে ধনিক-বিরোধী গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রচার আশা করা কতটা সঙ্গত?

১৯৪৫-এর সাধারণ নির্ব্বাচন নাকি বৃটেনে শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এনে দিয়েছে। গত নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের জয় অবশ্য প্রগতিশীল বৃটেনের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এই বিজয়ের ফলে বৃটেনের আর্থিক কাঠামোর এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এখনও ঘটেনি যাতে বৃটেনের কোটি কোটি মজুর ও মধ্যবিত্তের পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। শ্রমিক সরকার গঠিত হবার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হ’তে চলেছে; কিন্তু বৃটেনে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের কর্ত্তৃত্ব এখনও চোখে পড়ে। শ্রমিক গভর্নমেণ্টের নীতি যে অনেকখানি দক্ষিণপন্থী তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

গত যুদ্ধের ফলে বৃটেনের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত হ’য়ে পড়ে। বিদেশে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন বিক্রীত হওয়ায় ‘ওভারসিস ইনভেস্টমেণ্ট’-এর বার্ষিক আয় কুড়ি কোটি পাউণ্ড থেকে নেমে দশ কোটি পাউণ্ডের নীচে এসে দাঁড়ায়। এ ছাড়া স্টার্লিং পাওনা ইত্যাদি বাবদ ৩৫০ কোটি পাউণ্ড বৃটেনের বৈদেশিক ঋণ হিসাবে

সঞ্চিত হয়। এর ফলে খাদ্য ও কাঁচামালের যুদ্ধপূর্ব্ব আমদানীর পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লেও বৃটেনের পক্ষে রফ্‌তানী বাণিজ্যের বিপুল প্রসার অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক হয়ে পড়ে। গত নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিকদল উৎপাদন-ব্যবস্থা সুসঙ্ঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে মূল শিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই বিপুল ভোটে আইন সভায় নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু লেবর গভর্নমেণ্ট গঠিত হবার পর দীর্ঘ দিন অতীত হয়েছে; এখনও ইঞ্জিনিয়ারিং বা বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনের গতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। কয়লা-শিল্পের অবস্থা তো সাম্প্রতিক সঙ্কট থেকেই উপলব্ধি করা চলে।

এ কথা অস্বীকার করা বৃথা যে, সরকার জাতীয়করণের যে-পদ্ধতি আজ অনুসরণ করছেন তা স্পষ্টই সার্থক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরোধী। প্রতিক্রিয়াশীল মালিক শ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ না ক'রে উৎপাদনের প্রসার অব্যাহত রাখা চলে না। কিন্তু বৃটেনে এ পর্য্যন্ত জাতীয়করণের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠিত হ'য়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই পুঁজিপতি স্বার্থের সমাবেশ লক্ষ্যণীয়। লর্ড কেটোকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান আসনে রাখা হ'য়েছে। কয়লা বোর্ডের সভাপতি হ'য়েছেন লর্ড হিণ্ডলে; এই বোর্ডের নয়জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন হচ্ছেন বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি; শ্রমিক-আন্দোলন থেকে এতে মাত্র দুইজনকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। 'সিভিল এ্যাভিয়েশনে'র তিনটি বোর্ডের মধ্যে দু'টির সভাপতি হচ্ছেন স্যর হ্যারল্ড হার্টলে এবং জন বুথ। প্রথম ব্যক্তি জাহাজী স্বার্থের প্রতিনিধি। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধ বুথ-পরিবার ভুক্ত; এতেই বোধ হয় তাঁর পূর্ণ পরিচয় মেলে। এর পরও কি বলা সম্ভব যে, শ্রমিক গভর্নমেণ্টের জাতীয়করণের নীতি গণতান্ত্রিক স্বার্থের জয়যাত্রার পরিচয়?

বৃটিশ জনসাধারণের জরুরী প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে সরকার যে 'কর্জা আইন'-এর আশ্রয় নিয়েছেন তাও মোটেই ধনিক-স্বার্থের পরিপন্থী নয়। মূলধন নিয়ন্ত্রণের জন্যে ট্রেজারীর কার্য্যকরী সংগঠন হিসাবে যে 'মূলধন ইস্যুজ্ কমিটি' গঠিত হ'য়েছে তার ভেতর মালিকী স্বার্থের এমন বিপুল সমাবেশ যে, বিলটির মূল লক্ষ্যই এতে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। পাঁচটি বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর লর্ড কেনেট্ এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হ'য়েছেন। কমিটির সাত জন সদস্যের সকলেই ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী বা শেয়ার-বাজারের দালাল। এই কমিটির উপদেষ্টা 'ন্যাশনাল ইন্‌ভেস্টমেণ্ট কাউন্‌সিল'ও বড় বড় ব্যবসায়ীদেব মিলন-কেন্দ্র।

শ্রমিক গভর্নমেণ্টের আমলে যে ক'টি বাজেট তৈরী হ'য়েছে তাতে ধনিক শ্রেণীকে খুশি করবার আকাঙ্ক্ষাই স্পষ্ট ধরা পড়ে। সামাজিক বীমা পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইনেও দেখা যায় মালিকী স্বার্থকে ন্যূনতম আঘাতের চেষ্টা। এই কারণেই বেভারিজ স্কীমের অংশবিশেষকে ত্যাগ করতে হ'য়েছে।

শ্রমিক সরকারের শ্রমনীতি যে বৃটেনের শ্রমিকদের মৌলিক দাবীকে মেটাতে পারেনি, শিল্পবিরোধের বহর থেকেও তা স্পষ্টই ধরা পড়ে। গত বছর বৃটেনে যে-সব শিল্প-বিরোধ ঘটে, তাতে পাঁচ লাখের উপর লোক জড়িত হয়; মোট শ্রম-দিবস নষ্ট হ'য়েছে একুশ লাখেরও বেশী। একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই বিরোধের সংখ্যা ১৭৫; এতে মোট এক লাখেরও বেশী শ্রমিক জড়িত হয়েছে এবং এর ফলে পাঁচ লাখেরও উপর শ্রম-দিবস নষ্ট হয়।

বৃটেনে সমাজতন্ত্র আসন্ন মনে ক'রে যাঁরা গর্ব্ব বোধ করেন, উপরের সীমাবদ্ধ আলোচনা থেকেও তাঁরা সহজেই হতাশ হ'য়ে পড়বেন। তবুও

শ্রমিক সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতির অংশবিশেষকে যদি-বা সমর্থন করা চলে, বেভিন-অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি তো স্পষ্টই 'বৃটিশ গণতন্ত্রের' ঘৃণ্য ভণ্ডামির পরিচয়। বেভিনের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে বৃটেনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের গত ব্রাইটন অধিবেশনে মন্ত্রিসভার বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে পঁচিশ লক্ষ ভোট পড়ে। বেভিনের নীতি শ্রমিক দলের পদস্থ সদস্যদের মধ্যেও এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছে যে, সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের ৭০ জন শ্রমিক সদস্য এর সমালোচনা ক'রে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন।

ফ্যাশিজ্‌ম-এর আমূল উচ্ছেদ গত যুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষিত হ'য়েছিল। কিন্তু ফ্যাশিজম-এর অন্যতম প্রধান ঘাঁটি স্পেনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সরকার আজও অবধি কোনো কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করেননি। একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে যে, এর একমাত্র উল্লেখযোগ্য কারণ বৃটিশ শিল্পপতিদের বাণিজ্যিক স্বার্থ। বৃটেনের বৃহত্তম অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ভিকার্স লিমিটেড স্পেনের 'সোসাইটি অব নেভাল কনস্ট্রাকশন' নামক কোম্পানীর প্রধান অংশীদার। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এই সোসাইটি ফ্রাঙ্কো সরকারের নিকট থেকে দুটি যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের ভার পেয়েছে। স্পেনে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম পাইরাইটিস খনি রিয়োটিণ্টো বৃটিশ ব্যবসায়ীদের দখলে। এ ছাড়া স্পেনের বৃহত্তম দু'টি শহর মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার ট্রাম, বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থার মালিক কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানী। স্পেন থেকে প্রতি বৎসর এইভাবে ইংরেজ শিল্পপতিরা লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মুনাফা আহরণ করছে। এখন বোঝা সহজ যে, শুধু মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থের প্রয়োজনেই বৃটেনের শ্রমিক সরকার ফ্রাঙ্কো-ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করবার কাজে এগিয়ে আসছেন না।

আজ দু'বছর ধরে বৃটিশ সৈন্য গ্রীসে অবস্থান করছে। শুধু অবস্থান নয়, এক লক্ষ বৃটিশ সৈন্য তাদের সঙ্গীনের জোরে এমন এক প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, গ্রীসের জনসাধারণের মধ্যে যার বিশেষ কোনও সমর্থন নেই। একমাত্র বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতির জোরেই গ্রীক সরকার সেখানে সকল রকম গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যোগী হ'য়েছে। গ্রীসে রক্তস্রোত আজও বন্ধ হয়নি ; আর সে-জন্যে যে বৃটিশ নীতিই প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী তা বলা বাহুল্য।

উপনিবেশগুলিতে বৃটেনের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতির কোনই লক্ষ্যণীয় পরিবর্ত্তন ঘটেনি। যুদ্ধান্তে মিশর, প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্পষ্টই সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। ওদিকে বৃটেনের জাগ্রত শ্রমিক-আন্দোলনও দৃঢ় কণ্ঠে উপনিবেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবী জানাতে থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে। এ ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক ভাবে উপনিবেশগুলিতে 'স্বাধীনতা' স্বীকৃত হ'য়েছে বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা যে সাম্রাজ্যবাদই অধিকার ক'রে আছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ভারতবর্ষ।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়া দূরে থাকুক, বল্‌কানের ন্যায় বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ক'রে ভারতকে স্থায়ী বিভেদ ও সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুইটি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রের সৃষ্টিই দেশ বিভাগের শেষ নয়। হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করায় ভারতবর্ষ কতকগুলি শত্রুভাবাপন্ন খণ্ডিত অংশে পরিণত হ'তে চলেছে। এই সকল বিচ্ছিন্ন খণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে নূতন

ভাবে মৈত্রী স্থাপন ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র ভারতের উপর আর্থিক ও সামরিক কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখবার জন্যে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছে। নূতন বৃটিশ পরিকল্পনায় যে ধরনের 'স্বাধীনতা' ভারতকে দেওয়া হ'য়েছে তা আসলে কেবল জাতীয় ঐক্যকে দুর্ব্বল ক'রে সত্যকার ভারতীয় স্বাধীনতার পথে বাধাই সৃষ্টি করবে, আর তার সুযোগ নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে শোষণের স্বাধীনতা কায়েম রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

সোলবেরী গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সিংহলকেও অনুরূপ 'স্বাধীনতা' দানের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-বিভাগ এবং মুদ্রা-ব্যবস্থার উপর বৃটেনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল রেখে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে সিংহলকে এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করবার সুপরিকল্পিত আয়োজন চলেছে। সিংহলের বহির্ব্বাণিজ্যকে এমন ভাবে বৃটেনের করায়ত্ত করা হ'য়েছে যাতে অর্থনীতির দিক থেকে সে কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী বাণিজ্যিক সম্বন্ধের ফলে স্থির হ'য়েছে যে, অন্য কোনো দেশের সঙ্গে সিংহলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চা, রবার, নারকেল প্রভৃতির ব্যবসায় বৃটেনের অনুমতিসাপেক্ষ। এই হচ্ছে সোলবেরী-মার্কা 'স্বাধীনতা'র নমুনা!

মালয় সম্পর্কে যে-শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হ'য়েছে তাতেও দেখতে পাই সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষত রাখবার প্রাণপণ প্রয়াস। মালয়ের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্র ক'রে একটি 'মালয় ইউনিয়ন' গঠনের প্রস্তাব চোখে পড়ে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সিঙ্গাপুরকে পৃথক ক'রে এমনভাবে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে যুক্ত করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে যাতে এখান থেকে সারা সুদূর প্রাচ্যের জাতীয়

আন্দোলনকে ধ্বংস করা চলে। মালয় ইউনিয়নের আইন-পরিষদে মনোনীত সরকারী আমলাদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখবার চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট। সিঙ্গাপুরের আইন-পরিষদেও মাত্র নয় জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির প্রস্তাব করা হ'য়েছে। অথচ মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা ধরা হ'য়েছে এগার; এর মধ্যে আবার সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা নয়। নূতন গঠনতন্ত্রের খসড়ায় প্রতিক্রিয়াশীল সুলতানদের ক্ষমতা হ্রাসেরও বিশেষ প্রমাণ মেলে না। বরং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলে এদের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবারই বন্দোবস্ত হ'য়েছে। মালয়ের নূতন 'গণতান্ত্রিক' শাসনতন্ত্রের চেহারা এই।

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে বৃটিশ পরিকল্পনার স্বরূপ এখনও ঠিক জানা যায়নি। তবে সে-পরিকল্পনা যে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেবে না, তা অনেকটা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লীগের আপোসকামী নেতৃত্বকে হাত ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্রহ্মে যে-মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠন করেছে, সে তো স্পষ্টই প্রহসন মাত্র। ভারতবর্ষের ন্যায় ব্রহ্মদেশকেও বিভক্ত করবার ষড়যন্ত্র চলেছে। সীমান্ত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তদের সহযোগিতায় ব্রহ্মের চারিপাশে স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্রহ্মদেশের জাতীয় আন্দোলনকে বিনষ্ট করবার মতলব আঁটছে। এ-অবস্থায় ব্রহ্মদেশকে কি ধরনের 'স্বাধীনতা' দেওয়া হবে তা বোঝা কঠিন নয়।

ট্রান্সজর্ডনের বহুঘোষিত 'স্বাধীনতা'রই বা স্বরূপ কি? আমীর আবদুল্লার সঙ্গে বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক সন্ধির শর্ত্তানুযায়ী বৃটেন ট্রান্সজর্ডনে সৈন্য রাখবার এবং বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের অনুমতি পেয়েছে। স্থানীয় যান চলাচল ব্যবস্থার উপরও বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ট্রান্সজর্ডনের বিপুল সামরিক বাহিনী পোষণের ব্যয় বাবদ বৃটেন বছরে

আড়াই কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এর পরিবর্ত্তে অবশ্য এখানকার সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার অধিকার বৃটেনকে দিতে হয়। ইতিমধ্যেই এখানে দেড় লক্ষ বৃটিশ সৈন্য রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মধ্য ও নিকট প্রাচ্য জুড়ে আজ বৃটেন যে সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তের বেড়াজাল রচনার আয়োজন করছে, ট্রান্সজর্ডনকে 'স্বাধীন' করবার পরিকল্পনা তারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভূয়ো স্বাধীনতা দানের মূল প্রেরণা উপলব্ধি করতে হ'লে মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ রাজনীতির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় আবশ্যক।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্য সমেত গোটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বৃটেন অনেক দিন থেকেই সচেতন। প্রাচ্যের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রেরণাই প্রধানত বৃটেনকে এ-এলাকায় আধিপত্য বিস্তারে উৎসাহিত করে। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে জিব্রাল্টার, মাল্টা এবং সুয়েজ খালকে করায়ত্ত রেখেই বৃটেন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। যুদ্ধের পরও এ-ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিতই রয়েছে। জিব্রাল্টার অধীনে রেখে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দ্বার দখল ক'রে আছে। মাল্টা অধিকারে থাকবার ফলে ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বৃটেনের অবাধ কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর এ-অধিকার আরও বিস্তৃত হ'য়েছে। ইতালীর উপনিবেশগুলি দখল ক'রে বৃটেন ত্রিপোলিতানিয়া ও সাইরেনিকার উপকূল এবং বেনগাজি, তব্রুক ও ত্রিপোলি প্রভৃতি আফ্রিকাস্থিত বন্দরে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। প্যারিস সম্মেলনে বৃটেনের বৃহত্তর লিবিয়া গঠনের প্রস্তাবের পিছনে আসল উদ্দেশ্য যে ইতালীয় উপনিবেশগুলির উপর স্থায়ী প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে মধ্য ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত রাখা তা বোঝা কঠিন নয়।

সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগর দখলে রেখে বৃটেন ভূমধ্যসাগরের

পূর্ব্ব দ্বারে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সুয়েজ অঞ্চলের উপর একচ্ছত্র অধিকার থাকবার ফলে পূর্ব্বের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং নিকট প্রাচ্যের তৈল ব্যবসায় হস্তগত করা বৃটেনের পক্ষে সহজ হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্ত্তমানে এ-অঞ্চলের শতকরা ৫২ ব্যারেল তৈল বৃটিশ কোম্পানীর অধীন। কিন্তু যুদ্ধের পর বৃটেনের পক্ষে এ-অঞ্চলের গুরুত্ব অন্য কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়াব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন সমরায়োজনে মধ্যপ্রাচ্য যাতে পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল অংশ গ্রহণ করতে পারে বৃটেন তার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের আরবমণ্ডল থেকে সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করাই আজ অপেক্ষাকৃত সহজ। ইওরোপে শ্রমিক-আন্দোলন যেমন দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে তাতে মহাদেশ থেকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা একরকম অসম্ভব। যদিও জার্মানীর ইঙ্গ-মার্কিন এলাকায়, গ্রীসে অথবা ইতালীতে এর আয়োজন চলেছে, তবুও এই সকল রাষ্ট্রের দুর্দ্ধর্ষ জনশক্তি যে এ-আক্রমণকে প্রাণপণে বাধা দেবে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের এ-ভয় মজ্জাগত। তাই ট্রান্সজর্ডন, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশের সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে এ-অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েট-বিরোধী স্বার্থ গ'ড়ে তোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

১৯৩৬-এর ইঙ্গ-মিশর সন্ধির শর্ত্তানুযায়ী মিশরে বৃটিশ সৈন্য রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্'-এর কাইরো সংবাদদাতার মতে অনুমোদিত সৈন্যসংখ্যার দশ গুণ বৃটিশ সৈন্য মিশরে এখন অবস্থিত। ১৯৪৬-এর প্রথম দিকে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী ক'রে মিশরে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে ৭ই মে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই মিশর থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে

আনা হবে। কিন্তু ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনার বর্ত্তমান অবস্থা থেকে এ প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পালনের বিশেষ চেষ্টা ধরা পড়ে না।

আরব-ইহুদি বিরোধকে বাঁচিয়ে রেখে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ৮০ হাজার বৃটিশ সৈন্য বর্ত্তমানে এখানে মোতায়েন রয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য সামরিক ঘাঁটিতে প্যালেস্টাইন আজ সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন।

ইরাকেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা চোখে পড়ে। ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি অনুসারে বৃটেন ইরাকে একটি মাত্র বিমানঘাঁটি ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী রাখবার অনুমতি লাভ করে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, সমগ্র ইরাক আজ এক প্রকাণ্ড বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। এতদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার বৃটিশ সৈন্য এখানে মোতায়েন ছিল। সম্প্রতি বসরায় বৃটিশ তৈল-স্বার্থ রক্ষার জন্যে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ্রীসের তাঁবেদার সরকারের সহায়তায় বৃটেন দার্দানেলিস অঞ্চল প্রকারান্তরে দখল ক'রে আছে। ইজিয়ান সাগরের প্রবেশপথ দোদে-কানিজ সশস্ত্র বৃটিশ বাহিনীব অধিকারে। দার্দানেলিস অঞ্চলে শুধু আধিপত্য বিস্তার ক'রেই বৃটেন সন্তুষ্ট নয় ; এই এলাকা থেকে সোভিয়েট প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করবার জন্যে সে বদ্ধপরিকর। অথচ এ কথা কে না জানে যে, রুশিয়ার কৃষ্ণসাগরস্থিত বন্দর ওডেসা থেকে এ অঞ্চল পাঁচশ মাইল দূরে, আর বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বন্দর প্লিমাথ থেকে দার্দানেলিসের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার মাইল। এ ছাড়া কৃষ্ণসাগর দিয়ে বাণিজ্য-জাহাজ যাতায়াতের জন্যে দার্দানেলিস সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে অপরিহার্য্য। অন্যদিকে এ-এলাকায় বৃটেনেব আধিপত্য বিস্তারের প্রেরণা শুধু সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যেই নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের জন্যেও বটে।

এই প্রসঙ্গে ইঙ্গ-তুরস্ক সম্পর্কের উল্লেখ প্রয়োজন। দশ বছর পূর্ব্বে মণ্ট্রো কনভেনশন অনুযায়ী তুরস্ককে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় এক-চেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। তুরস্কের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো দেশের পক্ষে এ-জায়গা দিয়ে জাহাজ চালানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গত যুদ্ধে তুরস্ক ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হয়, এবং এ-এলাকা দিয়ে জার্মান জাহাজ চলাচলের সুযোগ দেয়। মণ্ট্রো কনভেনশনের পরিবর্ত্তন আজ তাই একান্তই আবশ্যক। শুধু সোভিয়েট রুশিয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে অথবা তুরস্ক কর্ত্তৃক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধেই নয়, আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যেও এর পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। বৃটেন কিন্তু মণ্ট্রো কনভেনশন পরিবর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। তুরস্ককে হাতে রেখে এ-অঞ্চল সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটিতে পরিণত করাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের আন্তরিক অভিলাষ। ইতিমধ্যেই তুরস্কে বহু বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মিত হ'য়েছে; বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে তুরস্কের বাহিনীকে সামরিক শিক্ষাদানের কথাও জানা যায়।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভূমধ্যসাগরের সবগুলি প্রবেশপথ আজ বৃটেনের অধিকারে। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার বহু দেশে বৃটেনের রাষ্ট্রিক অধিকার বর্ত্তমান; এবং এ-অঞ্চলের অধিকাংশ তৈলখনি বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে। এ ছাড়া জিব্রাল্টার, উত্তর আফ্রিকা, মাল্টা, ইতালী, গ্রীস, ইরাক, ট্রান্সজর্ডন, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ ক'রে বৃটেন ভূমধ্যসাগর, বল্কান পেনিনসুলা, এশিয়া মাইনর এবং লোহিত সাগরে দুর্জ্জয় ক্ষমতা কায়েম ক'রেছে।

লেভাণ্ট থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির শর্ত্ত পালিত হচ্ছে ব'লে মনে হয় না। লেবাননে আজও পর্য্যন্ত বৃটিশ

সামরিক কর্ম্মচারীরা অবস্থান করছে। সিরিয়াতেও বৃটেনের একটি বিমানঘাঁটি এবং কয়েক সহস্র সৈন্য বর্ত্তমান।

উত্তর ইওরোপের কয়েকটি দেশে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি এখনও চোখে পড়ে। আইসল্যাণ্ডের রেকজাভিকে বৃটেনের একটি বিমান ও একটি নৌ ঘাঁটি বিদ্যমান। ডেনমার্কের ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জে এবং নরওয়ে বন্দর স্টাভাঞ্জারে বৃটিশ নৌ-বাহিনী অবস্থিত।

শ্যামে বৃটিশ সৈন্য আজও বর্ত্তমান। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার কাজে সহায়তা ক'রে গত নভেম্বর মাসে বৃটিশ সৈন্য প্রবল জনমতের চাপে এদেশ পরিত্যাগ করে।

বৃটিশ 'গণতন্ত্রের' সমগ্র রূপটি স্বল্পাকার প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে বলা চলে যে, মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের শাসন ও শোষণ বৃটিশ 'গণতন্ত্রের' প্রাণবস্তু। যেখানে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের অভাবে সমগ্র দেশব্যাপী নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের বিরাট সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, অথচ জনকয়েক মুনাফাখোরের স্বার্থের তাগিদে লক্ষ লক্ষ কর্ম্মক্ষম যুবককে যুদ্ধাবসানের পরও সামরিক বাহিনীতে আটক রাখা হ'য়েছে, সেখানে কোন্ ধরনের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত তা বুঝতে অসাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

বৃটিশ 'গণতন্ত্রে'র স্বরূপ উপলব্ধির পর এবার মার্কিন 'গণতন্ত্রে'র দিকে চোখ ফেরানো যাক।

How to win the peace—Harry Pollitt

মার্কিন গণতন্ত্রের নমুনা

যুক্তরাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজিবাদের লীলাক্ষেত্র। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মার্কিন দেশের বিপুল ধনসম্পত্তি করায়ত্ত ক'রে রেখেছে। আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতিতে এদের প্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ১৯২১ সালে মার্কিন জাতীয় সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ আড়াই শত বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দখলে ছিল। ১৯৩৯ সালে এদের অধিকারে আসে শতকরা ৫০ ভাগ; আর আজ ১৯৫৭ সালে জাতীয় ঐশ্বর্য্যের শতকরা ৬০ ভাগ এদের মুঠির ভেতর। মর্গ্যান পরিবার একাই শতকরা ৩০ভাগ সম্পদেব মালিক। ৪৪৪টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শুধু মার্কিন দেশে অবস্থিত মর্গ্যান সম্পত্তির মূল্য ৭২,৬০০ বিলিয়ন ডলার। রকফেলার পরিবারের দখলে শতকরা ১৫ ভাগ জাতীয় সম্পদ। ২৮৭টি কোম্পানীতে রকফেলারদের স্বার্থ বিস্তৃত। ড্যুপঁ এবং মেলনরা জাতীয় সম্পত্তির শতকরা ১০ ভাগের মালিক। ১২৮টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেলন পরিবারের যোগাযোগ চোখে পড়ে।

ফেডারেল ট্রেড কমিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ বছর আগে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ (প্রধান প্রধান সম্পত্তিবানগণ) মার্কিন জাতীয় সম্পদের শতকরা ৫৯ ভাগ দখল ক'রে ছিল; জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ (নিম্নস্তরের ধনিকেরা) জাতীয় ঐশ্বর্য্যের শতকরা ৩৩

ভাগের ছিল মালিক। আর বাকী শতকরা ৮৭ জনের ভাগ্যে এসে জোটে শতকরা ৮ ভাগ মার্কিন সম্পদ। এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবার অর্থাৎ শতকরা ৪২ জন লোক জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ ভাগ মাত্র ভোগ করবার সুযোগ পায়। আবার ৩৬ হাজার সৌভাগ্যবান বিত্তশালী পরিবার অর্থাৎ শতকরা ০·১ জন লোক জাতীয় আয়ের ঠিক অনুরূপ অংশেরই মালিক ছিল। সোজা কথায়, উপর তলাকার ৩৬ হাজার পরিবার যে-পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভর ক'রত ঠিক সেই পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভর করতে হ'ত নীচের তলাকার এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবারকে। এই হচ্ছে 'স্বাধীন' আমেরিকার 'গণতন্ত্রে'র আসল চেহারা।

একচেটিয়া পুঁজিবাদ যুদ্ধপূর্ব্ব যুগেই মার্কিন রাষ্ট্রে কোন পর্য্যায়ে পৌঁছায়, নীচের একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে তা ধরা পড়ে। গত যুদ্ধের আগে অটোমোবিল এবং মোটর ট্রাক প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সংখ্যা ছিল মার্কিন দেশে প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। এদের মধ্যে বৃহত্তম তিনটি—জেনারেল মোটর্‌স্, ফোর্ড এবং ক্রাইস্‌লার ১৯৩৫ সালে আমেরিকায় উৎপন্ন আরোহী গাড়ীর শতকরা ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করে।

সম্প্রতি মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সরকারী রিপোর্টে সামরিক ঠিকাদারী কার্য্যে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অঙ্ক প্রকাশ করা হ'য়েছে। আমেরিকার জাতীয় অর্থনীতিতে 'ট্রাস্ট' প্রভৃতি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির মারাত্মক প্রভাব এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। যুদ্ধের সময় আটটি প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রভাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান গভর্নমেণ্টের সামরিক ঠিকাদারী কার্য্যের একচেটিয়া ভার লাভ করে। একশত মালিকী প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের পুরা কণ্ট্রাক্টের শতকরা ৬৭·২ ভাগ

পায়। এদের মধ্যে মর্গ্যান-ড্যুপঁর জেনারেল মোটর্‌স্‌ পায় শতকরা ৮ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ৪ ভাগেরও কম গোটা মুনাফার শতকরা ৮৪ ভাগ উপার্জ্জন করে।

ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্স যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংগঠন। এই এ্যাসোসিয়েশনের তেরো হাজার প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ প্রস্তুত ক'রে থাকে। সংগঠনটি বিভিন্ন কমিটির মারফৎ দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতিকে এমন অক্টোপাসের মত বেষ্টন ক'রে আছে যে, আমেরিকার একজন সাধারণ লোকের পক্ষে আজ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করা অসম্ভব। প্রতিযোগিতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না জেনেই এই ধরনের লোক সাধারণত স্বাধীন ব্যবসায় অপেক্ষা শেয়ার-বাজারে অর্থ নিয়োগ করাই বেশী পছন্দ করে।

হার্স্ট-প্যাটারসন ম্যাককরমিক-নিয়ন্ত্রিত মার্কিন প্রেসকে আর যাই বলা চলুক, গণতান্ত্রিক বলা চলে না। আমেরিকার বৃহত্তম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (যার বার্ষিক আয় এক কোটি ডলারের উপর) মুষ্টিমেয় ধনিকের কবলে। এঁরা শুধু প্রতিষ্ঠানটিরই মালিক নন, এর সংলগ্ন ১,১২৪ টি সংবাদপত্র এঁদের দখলে। আমেরিকার আরও একটি বৃহৎ সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড প্রেস' রয়-হাওয়ার্ডের কুক্ষিগত। উনিশটি সংবাদপত্র নিয়ে কুখ্যাত স্ক্রিপ্‌স্‌-হাওয়ার্ড গ্রুপের ইনি চালক।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র-ব্যবসায় যে একচেটিয়ার স্তরে এসে পৌঁছেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে। দৈনিক সংবাদপত্রের মৃত্যুর হার এখানে অত্যধিক উঁচু। ১৯২০ সালে আমেরিকায় ইংরেজী সংবাদপত্রের সংখ্যা

ছিল ২,০৪২ ; ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা নেমে ১,৭৫৪-তে দাঁড়ায়। মার্কিন দেশের ১,১০৩টি নগরে মোট একটি ক'রে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৫৯টি বড় বড় শহরে একটির বেশী সংবাদপত্র আছে বটে, কিন্তু তাদের মালিকানা একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাতে। আমেরিকার একজন ভূত-পূর্ব্ব প্রকাশক অসওয়াল্ড গ্যারিসন ভিলার্ডের মতে এক কোটি বা দেড় কোটি ডলার হাতে না নিয়ে মার্কিন শহরে কোনো সংবাদপত্র চালানো অসম্ভব। অল্প পুঁজি নিয়ে যে-সকল সাময়িকী প্রকাশিত হয় প্রতিযোগিতায় তারা টিকতে পারে না। বড় মূলধন সমর্থিত পত্রিকাগুলি আয়তনে স্ফীততর হয়েও দামে অনেক সস্তা। মূল্য কম হ'লেও বিজ্ঞাপনলব্ধ অর্থ থেকে এরা মুনাফার পাহাড় গ'ড়ে তোলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হিসাব ক'রে দেখা গেছে 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌'-এর এক কপি তৈরী করতে ১৪ সেণ্ট খরচ পড়ে; কিন্তু এ কাগজ বিক্রয় হয় ২ সেণ্টে। বিজ্ঞাপন থেকে যে-অর্থ আদায় হয় তাতে শুধু ক্ষতিটাই পুষিয়ে যায় না, মুনাফার অঙ্কও যথেষ্ট বড় হয়ে ওঠে।

আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের মারফৎ বছরে প্রায় ১৫০ কোটি ডলার খরচ হ'য়ে থাকে। এইভাবে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সংবাদপত্রের উপর তাদের প্রভাব বিস্তৃত করে। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক জর্জ সেল্ডস্‌ 'দি ফ্যাক্ট্‌স্‌ আর...' নামক পুস্তকে বলেন যে, ১৯৪০ সালে আমেরিকার যে-সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞাপন দেয় তাদের প্রত্যেকেরই এর জন্যে ৬০ লক্ষ থেকে দেড় কোটি ডলার পর্য্যন্ত খরচ হয়। এদের অনেক বিজ্ঞাপনই ভ্রান্তিমূলক ব'লে ফেডারেল ট্রেড বোর্ড মত প্রকাশ করে। কিন্তু যে-সকল সংবাদপত্র এই বিজ্ঞাপনগুলি গ্রহণ করে, তারা ট্রেড বোর্ডের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভাবে গোপন ক'রে যায়। এই ভাবে বিজ্ঞাপনদাতা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জন-

সাধারণের নিকট থেকে প্রকৃত সংবাদ লুকিয়ে রাখা হয়। সেল্ড্‌স্‌ আরও বলেন যে, যখন কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক চেহারা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যেমন যখন শোনা গেল যে জেনারেল মোটর্‌স্‌ কোম্পানী সামরিক উৎপাদনের পরিকল্পনা ব্যর্থ করবার চেষ্টা করছে বা এ্যালকোয়া প্রতিষ্ঠান হিটলারের স্বার্থে জাতীয় এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন নষ্ট করবার প্রয়াস পাচ্ছে, তখন এই সব কোম্পানীর বিজ্ঞাপনপুষ্ট সংবাদপত্রগুলি শুধু যে এই খবর লুকিয়ে রাখে তাই নয়, সরকারী তদন্তের ফলাফল পর্য্যন্ত বেমালুম গোপন ক'রে ফেলে। শুধু সেল্ডসের পুস্তক থেকেই অজস্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা চলে, যাতে বোঝা সহজ যে মার্কিন প্রেস কি অর্থে 'স্বাধীন', কোন শ্রেণীর 'স্বাধীনতা' রক্ষার জন্যে এর সচেষ্টতা।

আমেরিকায় রেডিও সাধারণত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রেডিওর উদ্দেশ্য এখানে জনসাধারণকে খাঁটি সংবাদ বিতরণ নয়, বুর্জোয়া স্বার্থের নির্লজ্জ প্রতিনিধিত্ব করা।

মার্কিন 'গণতন্ত্রে'র খাঁটি পরিচয় মেলে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে। আমেরিকার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ নিগ্রোর অধিকাংশ এই এলাকায় বাস করে। নিগ্রোদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার আজও মার্কিন গণ-তন্ত্রে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে, তা শুধু গত তৃতীয় দশকের হিটলার জার্মানীতে কল্পনা করা সম্ভব। সম্প্রতি জর্জিয়া স্টেটে ফ্যাশিস্ট ভাবাপন্ন 'কু ক্লুক্স্‌ ক্লান' দলের কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক প্রকাশ্য পথে নিগ্রো দম্পতি হত্যার করুণ কাহিনী সমগ্র জগত স্তম্ভিত হয়ে শুনেছে।

মার্কিন শাসনতন্ত্রে যদিও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, বংশ বা বর্ণের জন্যে কাউকে ভোটদানের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হবে না, কাজের সময় কিন্তু দেখা যায় যে দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের বেলায় এ-অধিকার নিষিদ্ধ। যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দক্ষিণ অঞ্চলে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত, তার গঠন-

তন্ত্রে প্রাথমিক নির্ব্বাচনে নিগ্রোদের সকলের ভোটদানের অধিকার নেই। মার্কিন গণতন্ত্র প্রকৃতই যে প্রহসনের শামিল, কুখ্যাত 'পোল ট্যাক্স'-এর প্রচলন থেকেই তা বেশ ধরা পড়ে। ভোটদাতা হিসাবে নাম রেজিস্ট্রির পূর্ব্বে একটা বিশেষ পরিমাণ ট্যাক্স না দিলে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লবের প্রথম যুগে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সম্পত্তিবানদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান স্তরে যখন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতেও জনসাধারণ ভোটদানের অধিকার অর্জ্জন করতে চলেছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশে এ-পদ্ধতির প্রচলন একান্তই মর্ম্মান্তিক। 'পোল ট্যাক্স' চল্‌তি থাকবার ফলে দক্ষিণ অঞ্চলে শুধু নিগ্রোরাই নয়, দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরাও ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সঙ্গে নিগ্রোদের আর্থিক বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। ১৯৩৬ সালে প্রাপ্ত সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, এ-অঞ্চলে তৎকালে একজন নিগ্রো শ্রমিকের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ৪৮০ ডলার; আর সে-জায়গায় একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবী পেত ১,১০০ ডলার। জমিহীন নিগ্রোর সংখ্যাও শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অনেক বেশী। শতকরা ৫০·৯ জন শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী নিজে জমির মালিক, আর সে-তুলনায় শতকরা ২০·৮ জন নিগ্রোর নিজের জমি আছে। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারেও নিগ্রো সন্তান-সন্ততিদের প্রতি গভীর অবজ্ঞার ভাব চোখে পড়ে। দক্ষিণের দশটি নিগ্রো সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে একটি শ্বেতাঙ্গ বালকের শিক্ষার জন্যে যা ব্যয় হয়, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচ করা হয় একটি নিগ্রো ছাত্রের জন্যে। উচ্চ শিক্ষা নিগ্রোদের পক্ষে দুর্লভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা বড় বড় কলেজে তাদের স্থান নেই। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আলাবামার ন্যায় একটি নিগ্রো সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ৬০০ জন আইনজীবীর মধ্যে

নিগ্রোদের সংখ্যা মাত্র ছয়। সামাজিক জীবনেও নিগ্রোদের প্রতি অনাদর। তাদের জন্যে পৃথক পার্ক, পৃথক খেলার মাঠ, পৃথক পাঠাগার, পৃথক হাসপাতাল, এমন কি গোরস্তান পর্য্যন্তও পৃথক। আধুনিক ইতিহাসে একমাত্র নাৎসি জার্মানীর ইহুদি দলনের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো দলনের তুলনা চলে।

মার্কিন গভর্নমেণ্টের শ্রমিক-নীতি থেকেও সরকারের 'গণতন্ত্র'-প্রীতির চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যুদ্ধান্তে মার্কিন দেশে শ্রমিক-অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ ক'রেছে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, ১৯৪৫-এর মে মাস থেকে ১৯৪৬-এর মে মাস পর্য্যন্ত এক বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে লিপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, এই ধর্ম্মঘট কয়লা, ইস্পাত, ইন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল শিল্পগুলিতে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন শিল্পপতিদের মুনাফার আয়তন বিপুল ভাবে বেড়ে যায়। এক ১৯৪৩ সালেই মাত্র ২,০০০ মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৮৮৫ কোটি ডলার মুনাফা কামায়। সে-তুলনায় যুদ্ধকালে শ্রমিকদের মজুরী বেড়েছে শতকরা ২৫ ভাগ, যদিও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে শতকরা ৪৫ ভাগ। যুদ্ধের সময় আমেরিকাব শ্রমিক শ্রেণী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ফ্যাশিস্ট-বিরোধী নীতির সমর্থনে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। সাধারণ চল্লিশ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম ক'রে শ্রমিকেরা উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়ে তোলে। এই বাড়তি মূল্য সৃষ্টির ফলেই মুনাফাখোরদের বিপুল আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর যুদ্ধপুষ্ট মার্কিন ধনিক শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩২-এর পর থেকে রুজভেল্টের উদারনৈতিক নীতির ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী বিশেষ কিছু সুবিধা ক'রে উঠতে পারেনি। এখন এরা ক্রমশ রাষ্ট্রিক যন্ত্র অধিকারের

আয়োজন করতে থাকে। গত নভেম্বর নির্ব্বাচনে রিপাব্লিকান পার্টির বিজয় এদের শক্তিবৃদ্ধির প্রমাণ।

প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথম আঘাত এসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। শ্রম-সময়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে দেওয়া হ'ল। • বেপরোয়া ছাঁটাই-এর ফলে বেকারের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ত্রিশ লাখে এসে ঠেকেছে। প্রাক্তন বাণিজ্যসচিব হেনরী ওয়ালেসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর আয় কয়েক মাসের মধ্যেই পঁচিশ বিলিয়ন ডলার কমে গেছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের অবিকল প্রতিধ্বনি করতে থাকেন। রুজভেল্ট-পরিকল্পিত 'ইকনমিক বিল অফ্ রাইট্‌স্' কোণঠাসা করা হ'ল। ১৯৩৫ সালে রুজভেল্ট 'ওয়াগ্‌নার এ্যাক্ট' অনুযায়ী শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার যে অধিকার দান করেন, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের আমলে সে সকল অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। শ্রমিক-অভ্যুত্থান ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনের শরণ নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'কেস্ বিল'। এই বিলের দ্বারা শ্রমিকদের সংগঠনী অধিকার প্রকারান্তরে হরণ করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। চুক্তিভঙ্গের জন্যে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যগণকেই দায়ী করবার প্রস্তাব করা হয়। ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দেবার জন্যে প্রেসিডেণ্টকে সৈন্য আমদানীর ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ল। রেল ধর্ম্মঘটের সময় সৈন্য আনিয়ে রেল চালানোর প্রচণ্ড হুমকি এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইত্যবসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ ডলার দক্ষিণা দিয়ে মুনাফালোভী পুঁজিপতিরা কংগ্রেসের সহায়তায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বাতিল করে। নিয়ন্ত্রণ কিছুটা উঠিয়ে দিতেই জিনিসপত্রের দাম হু হু ক'রে বেড়ে যায়। ইতিমধ্যেই খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক পরিচ্ছদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা

পনেরো ভাগ, আর ক্রেতাদের গড়পড়তা আয় কমেছে শতকরা আট ভাগ। আসলে কিন্তু এটা মার্কিন অর্থনীতির আসন্ন সঙ্কটেরই সূচনা। জনসাধারণের নিরুদ্ধ ক্রয়শক্তি এইভাবে দ্রুত নিঃশেষ হ'তে চলেছে।

গত যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন উৎপাদন-ব্যবস্থার বিপুল বিকাশ ও উন্নতি ঘটে। আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদায় ভাটা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশে মাল রফ্‌তানীর প্রয়োজনীয়তাও ভীষণ ভাবে বেড়ে যেতে বাধ্য। আমেরিকার সাম্প্রতিক পররাষ্ট্রনীতির দিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বিদেশে বাজার দখল করবার ব্যাপক আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে।

মার্কিন ধনপতিদের মুনাফা শিকারের উদগ্র লোভ আমেরিকাকে আজ স্পষ্টই চঞ্চল ক'রে তুলেছে। আজকের পৃথিবীতে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে দেশে দেশে উপনিবেশ স্থাপন সহজ নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থার সাহায্যে অনগ্রসর দেশগুলিতে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। অবাধ বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে দুনিয়া জোড়া আর্থিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। দক্ষিণ আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইওরোপে, মধ্য এবং দূর প্রাচ্যে আজ তারই অকুণ্ঠ আয়োজন চলেছে। কিন্তু আর্থিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেও সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। পৃথিবীর ৫৬টি দেশে ৪৩২টি সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ ক'রে এবং কুড়ি লক্ষ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রেখে যুক্তরাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণী তাদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। আসন্ন সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের আশায় মার্কিন ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি বাণিজ্যিক এবং সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-পরঘাতী আয়োজন শুরু করেছে তাতে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনাই ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। আমেরিকার নিকটবর্ত্তী উপকূল থেকে

৭,০০০ মাইল দূরে সাউদি আরবে দুই কোটি টাকা ব্যয় ক'রে মার্কিন বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হ'য়েছে; ৩,০০০ মাইল দূরে আইসল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য মোতায়েন করা হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব ইওরোপের নয়া গণতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্লক গঠনের উদ্দেশ্যে গ্রীস ও তুরস্ককে চল্লিশ কোটি ডলার সাহায্য দানের ব্যবস্থা চলেছে। সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব জর্জ মার্শাল যে-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উত্থাপন ক'রেছেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ২৫০ কোটি ডলার দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ইওরোপকে ক্রয় করা। এর পরেও কি মার্কিন 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে?

বর্ত্তমান মার্কিন বাজেটের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধায়োজনের বিবাট বহর চোখে পড়ে। মোট বাজেটের শতকরা ৪৫ ভাগ সৈন্য এবং নৌবাহিনীর জন্যে বরাদ্দ করা হ'য়েছে। যুদ্ধপূর্ব্ব ১৪০ বৎসরে সামরিক কার্য্যেব জন্যে আমেবিকার ব্যয় হ'য়েছে মোট ২,৪০০ কোটি ডলার, আব এখন যুদ্ধান্তে মাত্র এক বৎসরের সামরিক বাজেটে 'গণতান্ত্রিক' ও 'শান্তিপ্রিয়' মার্কিন সরকার সৈন্য ও নৌবাহিনীর জন্যে বরাদ্দ ক'রেছেন ১৬০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে সৈন্যবাহিনীর জন্যে ৭৫০ কোটি ডলার এবং নৌবাহিনীর জন্যে ৬৫০ কোটি ডলার ছাড়া ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার রাখা হ'য়েছে আলাস্কা, মারিযানা, ফিলিপাইন, হাওয়াই এবং অকিনাবাতে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণের জন্যে। মার্কিন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিরও নিরলস আয়োজন চলেছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মোট স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার। কয়েক মাস পূর্ব্বে মার্কিন সমরসচিব রবার্ট প্যাটারসন সানফ্রানসিস্কোর এক সভায় বলেন যে আমেরিকার সৈন্যসংখ্যা শীঘ্রই বাড়িয়ে পঞ্চাশ লক্ষ করা হবে; এর মধ্যে স্থায়ী সৈন্যেব সংখ্যা হবে

প্রায় দশ লক্ষ। ১৯৪০ সালের বিশেষ অবস্থার কথা বাদ দিলে বলা চলে যে, মার্কিন ইতিহাসে এই প্রথম শান্তির সময় বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি জারী করা হ'য়েছে। যুদ্ধ অনেকদিন শেষ হ'য়ে গেছে; তবুও অজস্র আণবিক বোমা তৈরী ক'রে মজুত রাখা হ'য়েছে। এর কার্য্যকরী শক্তি পুনরায় সুষ্ঠু ভাবে যাচাই করবার জন্যে কোটি কোটি ডলার খরচ ক'রে সম্প্রতি বিকিনিতে দুই-দুই বার পরীক্ষা হ'য়ে গেল।

মার্কিন বৈদেশিক দফ্তর আজ সম্পূর্ণভাবে সমরনায়কদের দ্বারা পরিচালিত। জেনারেল মার্শাল পররাষ্ট্রসচিবের আসনে অধিষ্ঠিত। অধিকৃত এলাকার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মেজর-জেনারেল জন্ হিলড্রিং। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ব্যক্তিদেরই রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা হ'য়েছে—যেমন, মস্কোয় জেনারেল বেডেল স্মিথ; বেলজিয়ামে ভাইস্ এ্যাডমিরাল কার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল হলকম্ব; এবং পানামায় জেনারেল হাইন্‌স। জাপানে রয়েছেন জেনারেল ম্যাক্-আর্থার, জার্মানীতে জেনারেল ক্লে ও অস্ট্রিয়ায় জেনারেল ক্লার্ক। এই সকল অভিজ্ঞ সমরনায়কদের সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের আয়োজনে মেতে উঠেছে।

মার্কিন ধনতন্ত্রের এই প্রসারকামী নীতি দিন দিন কেন এত তীব্র ভাবে সোভিয়েট-বিরোধী হ'য়ে উঠছে, তা বোঝা কঠিন নয়। মার্কিন পুঁজিবাদের সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব্বতোভাবে বাধা দেবে, প্রতিক্রিয়া-শীলদের এ-ভয় মজ্জাগত। কেবল তাই নয়; সোভিয়েটের শুধুমাত্র অস্তিত্বই যে বিশ্ব-ধনতন্ত্রকে দ্রুত দুর্ব্বলতর ক'রে তুলছে, রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাও স্পষ্ট বুঝতে পারছে। আজ তাই দেশে দেশে প্রসার-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়া এবং আন্তর্জ্জাতিক গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমর-

সজ্জারও ব্যাপক আয়োজন চলেছে। এই আয়োজনের তীব্র সমালোচনা করাতেই হেনরী ওয়ালেসকে সম্প্রতি পদত্যাগ ক'রতে হ'ল।

আমেরিকায় আজ যে-কেউ মার্কিন সরকারের এই পরঘাতী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের চেষ্টা করছে তাকেই 'হাউস অফ্ আন-আমেরিকান এ্যাফেয়ার্স কমিটি' কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়নের দাবী তুলছে। মার্কিন 'গণতন্ত্রের' আজ বাক্-স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিপন্ন! বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন এবং হলিউডের এডওয়ার্ড রবিনসন ও ডরোথি পার্কারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হ'য়েছে যে তাঁরা নাকি কমিউনিস্ট কার্য্যকলাপে লিপ্ত। হাওয়ার্ড ফাস্টের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সিটিজ্ন্ টম পেইন' বাজেয়াপ্ত করা হ'য়েছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতির কণ্ঠ রোধের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ধনপতিরা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরিকল্পনায় সাহায্যের জন্যে ব্যাপকভাবে নাৎসি বৈজ্ঞানিকদের আমদানী ক'রছে। স্টীফেন হোয়াইটের মতে এ পর্য্যন্ত ছয় শতের অধিক ফ্যাশিস্ত বিজ্ঞানবিদ আমেরিকায় পদার্পণ করেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রাক্তন নাৎসি সভ্য ডাঃ হাইনৎস্ ফিশারের ব্যবহারের জন্যে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারটি চাওয়া হয়। ফ্যাশিস্ত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ক্লাউস্ এ্যাশেনব্রেনার এখন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত। হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মার্কিন 'গণতন্ত্র' স্পষ্টই বিশ্বলুণ্ঠনের সর্ব্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে।

চীনের জাতীয় জীবন আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ক্ষত-বিক্ষত। সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি হিসাবে চীনকে ব্যবহার ক'রে চীনাবাসীর উপর স্থায়ী শোষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সমগ্র চীন ব্যাপী যে-গৃহযুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, সে যে মার্কিন নীতিরই

স্বাভাবিক পরিণতি তা বোঝা কঠিন নয়। কুয়োমিণ্টাঙের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়কে সাহায্য পাঠিয়ে চীনের জাগ্রত গণ-আন্দোলন দমনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অসামান্য তৎপরতা বিশ্বের শান্তিকামীদের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

জাপানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করবার কাজে সাহায্যের জন্যেই মার্কিন সৈন্য চীনে এসেছিল। কিন্তু আজ জাপানী যুদ্ধ শেষ হ'বার দুই বছর পরেও চীনে সাংহাই ও সিনপাওতে ৮০ হাজার মার্কিন সৈন্য মোতায়েন র'য়েছে। পিপিং, টিনসিন, সিংটাও, নানকিং, সাংহাই, চেঙ্গটু, চুংকিং, কানমিং প্রভৃতি অঞ্চলে অজস্র মার্কিন বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হ'য়েছে। সিংটাও ও সাংহাইতেও মার্কিন নৌ-ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছে শুধু সিংটাও-তেই ত্রিশ হাজার মার্কিন নৌবহর সজ্জিত র'য়েছে। চীনের অন্তর্যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। চিয়াং কাইশেকের দলকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে তাই নয়, মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষদের তত্ত্বাবধানে এ পর্য্যন্ত ৪০ ডিভিশন কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে। মার্কিন বিমান এবং অন্যান্য চলাচলের যানে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদের বিনা খরচে উত্তর রণাঙ্গনে পৌছিয়ে দেবার সংবাদও পাওয়া যায়।

উদ্বৃত্ত যুদ্ধসামগ্রী কুয়োমিণ্টাংকে সাহায্য ক'রে মার্কিন পুঁজিপতিরা চিয়াং-এর নিকট থেকে যে-বাণিজ্যচুক্তি আদায় ক'রে নিয়েছে, তার ফলে চীন দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হতে চলল। যুদ্ধের পূর্ব্বেই মার্কিন পুঁজিপতিদের কুড়ি কোটি ডলার মূল্যের মূলধন চীনে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধশেষে আজ মার্কিন পুঁজিতন্ত্রের নাগপাশ চীনের বিপর্য্যস্ত অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন ক'রে ফেলেছে।

চীন-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত্ত অনুযায়ী উভয় দেশের

নাগরিকদের পরস্পরের এলাকায় জমি কেনবার, খনি খুঁড়বার এবং অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্য করবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছে। এর ফলে শীঘ্রই চীনের লৌহ-কয়লা প্রভৃতি খনিগুলি মার্কিন পুঁজিপতিদের করায়ত্ত হবে, অনগ্রসর চীনে মার্কিন কলকারখানা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং এইভাবে অনতিবিলম্বে মার্কিন মূলধন গোটা দক্ষিণ চীন গ্রাস ক'রে ফেলবে। বাণিজ্যগত সমানাধিকারের স্বীকৃতি আসলে মার্কিন পুঁজিবাদের বিস্তৃতিরই সাহায্য করবে, কারণ চীনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো এক শত গুণ বেশী শক্তিশালী।

গত ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইনকে 'স্বাধীনতা' দানের সংবাদ অত্যন্ত ফলাও ক'রে মার্কিন পেসে প্রকাশ করা হ'য়েছে। বারো বৎসর পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি এমন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হ'তে দেখে বিস্মিতই হ'তে হয়। কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে দেরী হয় না যখন দেখি 'স্বাধীনতা'র বড় বড় বুলির আড়ালে ফিলিপাইনকে যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত করবার পাকা বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। 'ফিলিপাইন ট্রেড এ্যাক্ট' এবং 'প্রপার্টি বিল' আসলে দাসখতেরই প্রতীক। 'ট্রেড এ্যাক্টে' আটাশ বছরের জন্যে ফিলিপাইনের সমগ্র জাতীয় সম্পদ মার্কিন পুঁজিবাদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই আইনের জোরে ফিলিপাইনকে দীর্ঘ দিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচা মালের বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হবে। 'প্রপার্টি বিল' অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনে নিজের খুশি মতো সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করবার অধিকার নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। দেশদ্রোহী জাপানী দালাল ম্যানুয়েল রকসাসকে 'স্বাধীন' ফিলিপাইনের সভাপতি 'নির্ব্বাচিত' ক'রে 'ট্রেড এ্যাক্ট' এবং 'প্রপার্টি বিল' দ্রুত কার্য্যকরী করবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

নব্বুই হাজার সশস্ত্র মার্কিন সৈন্য এবং অজস্র সামরিক ঘাঁটি বুকে নিয়ে ফিলিপাইন আজ যে-'স্বাধীনতা' ভোগ করছে, তার কথা ভাবতেও গা শির-শির ক'রে ওঠে।

পট্‌স্‌ডাম বৈঠকে জার্মানী ও জাপানের ফ্যাশিস্ত আর্থিক কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই সকল দেশে মার্কিন কার্য্যকলাপের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, ফ্যাশিজ্‌ম্‌কে উচ্ছেদ করা দূরে থাকুক, তাকে পুনরায় শক্তিশালী ক'রে তোলাই যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নীতির মূল লক্ষ্য। এর কারণ প্রধানত জার্মানী ও জাপানের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব। এ দু'টি রাষ্ট্রে ফ্যাশিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে দাবিয়ে রাখা, একাধিক পদস্থ মার্কিন সরকারী কর্ম্মচারীর প্রকাশ্য উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিলগোর রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জার্মানীতে মার্কিন সামরিক শাসন-বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই খ্যাতনামা একচেটিয়া ব্যবসায়ী। জার্মানীর অনেক কারখানার আবার এরাই মালিক। এদের পক্ষে তাই জার্মান সমরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রেরণা স্বাভাবিক। কিছুদিন পূর্ব্বে মার্কিন সৈন্যরা জার্মানীর বিখ্যাত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান 'স্‌থেরিং' কোম্পানীর যে গুপ্ত দলিল আবিষ্কার করেছে তা থেকেই বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে জার্মানীতে আবার ফ্যাশিজ্‌ম্ কিভাবে মাথা তোলবার চেষ্টা ক'রেছে।

ম্যাক্-আর্থারের স্বৈরাচারী শাসন জাপানকে 'গণতন্ত্রের' পথে কত দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা অজানা নয়। জাপানের ফ্যাশিস্ত অর্থনীতির মূল বনিয়াদ 'জেইবাৎসু'-র বিরুদ্ধে তেমন কোনও কার্য্যকরী আঘাত হানা মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ এখনও সমীচীন বোধ করেননি; তবে শ্রমিক

আন্দোলনের উপর নৃশংস দমননীতি চালিয়ে 'গণতান্ত্রিক' আমেরিকা জাপানে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করছে!

গত যুদ্ধের সময় পৃথিবীর ছাপ্পান্নটি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজস্র নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্ম্মাণ করে। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলেও এ-ঘাঁটিগুলির অবস্থিতি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এগুলির প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখনও শেষ হয়নি। অতলান্তিক মহাসাগরে এ্যাণ্টিগুয়া, ত্রিনিদাদ, জ্যামাইকা, বার্মুডাস, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বৃটিশ গিনি, ল্যাব্রাডার এবং এ্যাজোর্স অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য সামরিক ঘাঁটিগুলি এখনও বর্ত্তমান। প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ ফিনিক্স দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন ও মেলবোর্ন বন্দরে এবং মানুশ দ্বীপে অজস্র মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এখনও পর্য্যন্ত চোখে পড়ে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এ-এলাকায় অনেক জায়গায় মার্কিন সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যুদ্ধান্তে এরা চলে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ দৃঢ় হ'য়ে বসবারই চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে সাউদি আরবে অনেকগুলি বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হ'য়েছে। দাহারানে সম্প্রতি এক বিরাট বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের সংবাদ পাওয়া যায়। রাজা ইব্‌ন সাউদের সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী তিন বছরের জন্যে এটা মার্কিন তত্ত্বাবধানে রাখা স্থির হ'য়েছে। সাউদি আরবকে এক কোটি ডলার ধার দিয়ে মার্কিন পুঁজিবাদ এ-অঞ্চলে প্রবেশের পথ খুঁজে নিল। মধ্য প্রাচ্যের তৈলখনিগুলি দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের করতলগত হ'তে চলেছে। ইতিমধ্যেই এ-অঞ্চলের আবিষ্কৃত তৈলসম্পদের শতকরা ৪২ ভাগ মার্কিন পুঁজিবাদের দখলে এসে পড়েছে। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ্‌স্ কর্পোরেশন পারস্য সাগর থেকে ভূমধ্য সাগরের

দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট ট্রান্স-অ্যারাবিয়ান পাইপ লাইন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। লেবানন, ট্রান্সজর্ডন, প্যালেস্টাইন এবং সাউদি আরবের সরকার তাঁদের নিজ নিজ এলাকা দিয়ে লাইনটি চালু করবার অনুমতি দেওয়ায় এর কাজ সম্প্রতি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পুঁজিবাদের দ্রুত বিস্তৃতি বৃটেনকেও স্পষ্টই আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাবেল মান্দেব প্রণালী, এডেন এবং পেরিমের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। আমেরিকার সামরিক সম্পত্তি রক্ষার জন্যে দুই হাজার মার্কিন ফৌজ মিশরে মোতায়েন রয়েছে। কাইরো এবং পেনফিল্ডের কয়েকটি বিমানঘাঁটি বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। তুরস্কে মার্কিন সৈন্যের অবস্থিতির সংবাদ সম্প্রতি বিদেশী সংবাদপত্র থেকে জানা যায়। আফ্রিকাস্থিত আলজিয়ার্স, বোন, ক্যাসাব্লাঙ্কা, মারাকেশ এবং ডাকারে অসংখ্য মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বর্ত্তমান।

উত্তরে আইসল্যাণ্ডে এখনও মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। স্থানীয় জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রেকজাভিকে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। প্রায় এক সহস্র সৈন্য সেখানে মোতায়েন রয়েছে। দিনেমার দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ডেও যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটি বর্ত্তমান।

যুদ্ধকালে ল্যাটিন আমেরিকায় নির্ম্মিত সামরিক ঘাঁটিগুলি আজও যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। অতলান্তিক মহাসাগরের উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই ঘাঁটিগুলি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাকে শিকলের মতো বেষ্টন ক'রে আছে। মারাকাইবো, কারাকাস, বেলেম, নাতাল, সানসালভেডর, ফর্টালেজা, রাইও ডি জেনিরো, মণ্টিভিডো,

বুয়োনস আয়ার্স, সান্তিয়াগো, লিমা, কালি, গৌটিমেলা, মেক্সিকো, পানামা এবং কিউবাতে অসংখ্য মার্কিন ঘাঁটি এবং লক্ষ লক্ষ ফৌজ বর্ত্তমান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত 'গণতন্ত্রের' বিস্তৃত বিবরণ স্থানসাপেক্ষ। তবে উপরের আলোচনা থেকে বোঝা সহজ যে, মুষ্টিমেয় ধনপতির নিরঙ্কুশ শোষণ এবং দুই গোলার্দ্ধ ব্যাপী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও অসংখ্য সামরিক ঘাঁটির সাহায্যে দুনিয়ার বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা বর্ত্তমান মার্কিন 'গণতন্ত্রে'র মূল বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপঞ্জী

America's 60 Families—Ferdinand Lundberg

Who owns America?—James S. Allen

World Monopoly and Peace—James S. Allen

সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রকৃতি

বৃটিশ ও মার্কিন 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে, এ-সকল রাষ্ট্রের আর্থিক গড়ন এমন যে খাঁটি গণতন্ত্রের বিকাশ এখানে সম্ভব নয়। উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকবার ফলে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী সৌভাগ্যবান গোটা সমাজটাকে নিজেদের খুশিমতো চালাতে পারে। রাষ্ট্রযন্ত্র আসলে এদের স্বার্থ রক্ষার উপায় মাত্র। রাষ্ট্রিক অস্ত্রবলের সাহায্যে ধনিকেরা শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক নিরাপদ রাখবার প্রয়াস পায়। মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে ক্রমবর্দ্ধমান শোষণের ক্ষেত্র এদের চাই। তাই এ-সব রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূল কথাই হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিকে লুণ্ঠন করা।

অন্যান্য শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রের ন্যায় বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রেও স্বভাবতই শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ বর্ত্তমান। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, এ-সকল দেশের শাসক সম্প্রদায় কোনো ক্রমেই সমগ্র জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না। যেখানে সম্মিলিত স্বার্থের কল্পনা করা যায় না, সেখানে গণতন্ত্রের কথা ওঠে কি ক'রে? আসলে এসব কথা ধনিক শ্রেণীর শোষণের সুযোগ মাত্র। এই সকল ভাঁওতার আড়ালেই মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার চেষ্টা করে। এবং আমেরিকায় প্রচলিত 'গণতন্ত্রে'র আদর্শ যে

সামাজিক বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান স্তরে একেবারেই অচল, এ কথা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। গত এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা থেকে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের অসারতা বুঝতে পেরে দেশে দেশে গণ-আন্দোলন আজ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকেই মূল লক্ষ্য ধরে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ভোটের অধিকারকেই যদি গণতন্ত্রের খাঁটি নিরিখ হিসাবে ধরা যায়, তবে বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত জনসাধারণের দীর্ঘকাল এ-অধিকার ভোগ করা সত্ত্বেও আজও পর্য্যন্ত কেন তারা সকল প্রকার শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেল না? এখনও কেন এই সকল প্রকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে বছরের অধিকাংশ সময় বেকার জীবন যাপন করতে হয়? শ্রমিক-অসন্তোষ কেন ছাই-চাপা আগুনের মতো বার বার জ্বলে ওঠে? আসলে আর্থিক বৈষম্যের উপর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'লে রাষ্ট্রিক সমানাধিকার কখনও প্রকৃত গণতন্ত্রের দাবী মেটাতে পারে না।

একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়ার আর্থিক কাঠামোই পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী। শুধু মাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রেই সকল প্রকার শোষণের পূর্ণ অবসান ঘটেছে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হওয়ায় সোভিয়েট সমাজে প্রত্যেকটি নরনারী আজ জীবনে সমান সুযোগের অধিকারী। শ্রেণীবিহীন সমাজ এখনও গড়ে ওঠেনি সত্য, কিন্তু নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত। সোভিয়েটের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রেণীবিরোধ আজ তাই অতীত ইতিহাসের ঘটনা মাত্র।

সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রের রূপ এবং ভূমিকারও আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষ্যণীয়। বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বার্থ

রক্ষা। সোভিয়েট রুশিয়ায় কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ঠিক এর বিপরীত। নভেম্বর-বিপ্লবের পর রুশ দেশে ট্রট্স্কী বুখারিন প্রভৃতির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের পরাজিত ধনিক শ্রেণী আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করে। তাদের সেই অন্তিম স্বপ্নকে চূর্ণ ক'রে দেয় সোভিয়েটের রাষ্ট্রিক অস্ত্রবল। আজ রুশিয়ায় শোষক সম্প্রদায়ের শেষ চিহ্ন লুপ্ত হওয়ায় দেশে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে বটে, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক পুঁজিবাদের তরফ থেকে সশস্ত্র আক্রমণের আশঙ্কা এখনও বর্ত্তমান। ফ্যাশিজমের পরাজয়ের পর আজ ইঙ্গ-মার্কিন ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সারা বিশ্বের রক্ষণশীল সম্প্রদায় সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছে। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে রুশিয়ার পক্ষে এখনও রাষ্ট্রিক অস্ত্রবলের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। আজকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বোঝা সহজ যে, মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস্‌ সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রশক্তির যে-অন্তর্দ্ধানের কথা ব্যক্ত ক'রেছেন, রুশ দেশে অনিবার্য্য কারণেই এখন পর্য্যন্ত তা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। তবে সোভিয়েট দেশে রাষ্ট্র যে এক আমূল পরিবর্ত্তিত ভূমিকায় অবতীর্ণ, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে এ-সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে সোভিয়েট অর্থনীতি সকল প্রকার আর্থিক সঙ্কট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'সাইক্লিক ক্রাইসিস' (সঙ্কটের পুনরাবর্ত্তন) ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। সেখানে একদিকে র'য়েছে ধনিকের মুনাফা আহরণের ক্রমবর্দ্ধমান তাগিদ, কিন্তু আর-এক দিকে বিদ্যমান জনসাধারণের সীমাবদ্ধ ক্রয়শক্তি। এই দু'য়ের বিরোধ যে-সংঘাতের সৃষ্টি করে তারই ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত বাড়তি উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়।

মালিক শ্রেণীর অতিরিক্ত মুনাফা বৃদ্ধির প্রেরণায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠিত হয়, উৎপাদন-শক্তির বিপুল বিস্তৃতি ঘটে। নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে আবার কার্য্যরত শ্রমিকের সংখ্যা সঙ্কুচিত হ'তে বাধ্য হয়। এইভাবে একদিকে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে চলে, কিন্তু ভোগ করবার লোকের ক্রয়শক্তি কমতে থাকে। এই অসঙ্গতি শেষে এমন এক স্তরে এসে পৌছায়, যখন ভোগ্যবস্তু অবিক্রীত অবস্থায় প'ড়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরিণামে উৎপাদনের সঙ্কোচন শুরু হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়, বেকার-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে, ধনতান্ত্রিক দুনিয়া ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট ছড়িয়ে পড়ে।

এ থেকে পশ্চিমের 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রগুলি যেভাবে পরিত্রাণের চেষ্টা করে, তাতে শুধু তাদের আসল চেহারাই ধরা প'ড়ে যায়। ১৯২৯-'৩৩ সালের দুনিয়া জোড়া বাণিজ্য-সঙ্কটের কালে যখন ধনতান্ত্রিক জগতে জিনিসপত্রের মূল্য ধাঁ ধাঁ ক'রে নামতে শুরু করে, কোটি কোটি নরনারী অনিবার্য্য অনশনের মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়, তখন সেই দুর্দ্দিনে সঙ্কটের হাতে থেকে মুক্তির জন্যে মার্কিন পুঁজিপতিরা লক্ষ লক্ষ টন গম নষ্ট ক'রে ফেলে। গণতন্ত্রের কি নির্লজ্জ প্রহসন! বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা অনেক সময় আর্থিক উপার্জ্জনের পুনর্বণ্টনের মধ্যে ব্যবসায়-সঙ্কটের সমাধান খোঁজেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, এই ধরনের সঙ্কট শুধু মাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই দেখা দেয়; প্রাক-ধনিক সমাজে 'আণ্ডার কনসাম্পশান' বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চক্রাকারে সঙ্কটের পুনরাবর্ত্তন ঘটেনি। তা ছাড়া স্পষ্টই দেখা যায় যে আর্থিক সঙ্কট শুরু হবার ঠিক আগে শ্রমিকদের উপার্জ্জনের তহবিল সাধারণত বেড়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ-সঙ্কট হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অতি-উৎপাদনের; একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেই এর বীজ নিহিত।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, যতদিন মুনাফার তাগিদে উৎপাদন চলে, ততদিন কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে এ-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ মেলে না। আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ দূরীভূত হ'তে পারে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হ'লে। শুধু সোভিয়েট সমাজের গড়ন এই ধরনের ব'লেই আর্থিক এবং আনুষঙ্গিক সঙ্কট থেকে এই নূতন সমাজ আজ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। দারিদ্র্য সেখান থেকে চিরকালের জন্যে নির্ব্বাসিত, বেকারির বিভীষিকা লুপ্ত, এবং দেশব্যাপী অবাধ আর্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত। শুধু কি তাই? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা রুশ দেশে নূতন চেতনার জন্ম দিয়েছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে মানুষের মনের যে-কুৎসিত মূর্ত্তি অহরহ পীড়া দেয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ তা কল্পনা করা অসম্ভব। আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত সোভিয়েট মানস বিপুল সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল।

তথাকথিত 'বাড়তি উৎপাদনের' সমস্যা অনুপস্থিত ব'লেই সোভিয়েট আর্থিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের পূর্ণতম প্রয়োগ সম্ভব। পশ্চিমের 'গণ-তান্ত্রিক' রাষ্ট্রে আর্থিক সঙ্কট এড়াবার জন্যে নূতন নূতন যান্ত্রিক আবিষ্কার ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। এই-খানেই সোভিয়েটের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বিস্তৃততর ক'রে তোলে। এর ফলে দেশের বিরাট জনসাধারণের জীবন-যাত্রা স্বভাবতই সচ্ছলতর হ'য়ে ওঠে। পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েট রুশিয়া আজ কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দিক থেকে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় আসন লাভ ক'রছে। সম্প্রতি আরব্ধ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫০ সালের মধ্যেই সোভিয়েট

রুশিয়ায় শিল্প কৃষি এবং জাতীয় আয় ১৯৪০ সালের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৮, ২৭ এবং ৩০ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্কল্প করা হ'য়েছে। গত যুদ্ধের বিরাট ক্ষতি সত্ত্বেও এ-পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত, কারণ এর পিছনে র'য়েছে রুশ জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ সক্রিয় সমর্থন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির অর্থ দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর অবস্থার উন্নতি, এই বিশ্বাস আছে ব'লেই রুশিয়ায় স্টাখানভ-আন্দোলন সম্ভব হ'য়েছে। বৃটেন অথবা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের আন্দোলন কল্পনার অতীত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাজ শুরু হবার বার বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের পরিমাণ পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। ১৯২৮ সালে রুশিয়ায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২,৫০০ কোটি রুবল, ১৯৪০-এ এই আয় ১২,০০০ কোটি রুবলে পরিণত হয়। সমগ্র জাতির এই আয়বৃদ্ধি সোভিয়েট ভূমির প্রত্যেকটি অধিবাসীর বিপুল উপার্জ্জন বৃদ্ধিরই প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিমের শ্রেণীবিভক্ত 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে জাতীয় আয়বৃদ্ধি জনকয়েক সৌভাগ্যবানের ঐশ্বর্য্য স্ফীতির চিহ্ন মাত্র। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের বাৎসরিক গড় উপার্জ্জন সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৩৩ সালের ১,৫১৩ রুবল থেকে ১৯৩৮ সালে ৩,৪৪৭ রুবলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত হবার ফলে শ্রমিকদের সংখ্যা শতকরা ১৮ ভাগ বেড়েছে; জাতীয় মাহিনা তহবিল বাড়ে শতকরা ১৫১ ভাগ অর্থাৎ আড়াই গুণ। 'আসল মজুরি' শতকরা ১০১ ভাগ অর্থাৎ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েট জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল উন্নতি লাভ করে, তার প্রমাণ মেলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তৃতিতেও। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় (১৯৩৩—'৩৭) রাষ্ট্রিক ও সমবায় বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠানগুলির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ আড়াই গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকের ক্রয়শক্তি এতটা বেড়ে যায় যে, ভোগ্যবস্তুর বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট যোগানের চেয়ে মোট চাহিদা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। উন্নততর পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে।

শুধু মজুরি বৃদ্ধিই নয়, সোভিয়েট জনসাধারণ রাষ্ট্র এবং ট্রেড-ইউনিয়নের নিকট থেকে বিনা খরচে নানা সুবিধা ভোগ করে। রাষ্ট্রের ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্যে সার্ব্বিক বীমার সুযোগ র'য়েছে। অসুস্থতা, অকর্ম্মণ্যতা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু—সকল অবস্থাতেই বীমার ব্যবস্থা চোখে পড়ে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ায় বীমাকারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং সামাজিক বীমা বাজেটের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। ১৯২৯ সালে বীমাকারী শ্রমিকেরা সংখ্যায় ছিল এক কোটি দশ লক্ষ; ১৯৪০ সালে এদের সংখ্যা তিন কোটিরও উপরে ওঠে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সামাজিক বীমার কাজে জাতীয় ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ১,০০০ কোটি রুবল; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২,৬৫০ কোটি রুবলে।

এর পর আসে জাতীয় জন-স্বাস্থ্যের কথা। সোভিয়েট দেশে প্রত্যেকটি নরনারীর সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার রাষ্ট্রের হাতে; রাষ্ট্রেরই খরচে এই বিভাগের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হ'য়ে থাকে। ১৯৩৭ সালে ১০,৩০ কোটি রুবল সোভিয়েট জনস্বাস্থ্যের জন্যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ব্যয় করা হয়; ১৯১৩ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ৭৫ গুণ বেশী। বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়ায় চিকিৎসকদের মোট সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারেরও কম; ১৯৩৭ সালে এদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩২

হাজারে। গ্রাম্য অঞ্চলে এদের সংখ্যা ১৯১৩ সালের তুলনায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায়।

ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই সোভিয়েট সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকল্যাণ-সমিতিতে তার নাম রেজেস্ট্রি করা হয়। এইভাবে জন্মাবার পর মুহূর্ত্তেই সোভিয়েট শিশু চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসে। শিশুর খাদ্য এবং দৈনন্দিন কার্য্যসূচী বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জননীকে চলতে হয়। আটাশ দিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়স্ক শিশুকে নার্সারিতে গ্রহণ করা হয়। জননী এখানে চিকিৎসক এবং নার্সের তত্ত্বাবধানে সন্তানকে রেখে কর্ম্মস্থলে গিয়ে থাকেন। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট নার্সারিগুলি ৪০ লক্ষ শিশুকে এইভাবে স্থান দেয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নার্সারিতে শিশুদের স্থান সঙ্কুলান শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্তানসম্ভবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে দেখা-শোনা করবার জন্যে সোভিয়েট দেশে ৪,৩৮৪টি মাতৃসদন আছে। শিশুসদন ও মাতৃসদনের সংখ্যা এখানে প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। তিন বছরের মধ্যেই এই সব প্রতিষ্ঠানের জন্যে খরচ তিন গুণ বেড়ে যায়; ১৯৩৭ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৭ কোটি রুবলে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারী শ্রমিকেরা প্রসবের পূর্ব্বে ৩২ দিন এবং পরে ২৮ দিন পুরা বেতন সহ ছুটি ভোগ করেন।

শিল্পাঞ্চলে আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা চোখে পড়ে। প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছাড়াও শিল্প-এলাকায় শ্রমিকদের সুবিধার জন্যে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে ৭,৬৩১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হ'য়েছে। বিশেষ চিকিৎসার জন্যে শ্রমিকদের 'পলিক্লিনিকে' নিয়ে যাওয়া

হয়। এখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল রকম মূল্যবান সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট আমলে পলিক্লিনিকের সংখ্যা সাড়ে সাত গুণ বেড়ে গেছে; আগের তুলনায় দশ গুণ বেশী রোগীকে বর্ত্তমানে এতে আশ্রয় দেওয়া হয়।

নভেম্বর-বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশ শহরাঞ্চলে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিল ৮৯,২০০ এবং পল্লী-অঞ্চলে ৪৯, ৪২৩; ১৯৩৭ সালে এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯৬,০০০ এবং ১৭৫, ৯৫৫-তে দাঁড়ায়। ১৯৩২ সালে এগার লক্ষ সোভিয়েট শ্রমিক স্বাস্থ্যাবাসের আরাম উপভোগ করে। ১৯৪০ সালে এদের সংখ্যা হয় ২৪ লক্ষ।

যৌনব্যাধি এবং ক্ষয়রোগ সোভিয়েট সমাজে আজ এক রকম লুপ্ত বলা চলে। নূতন আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এই সকল রোগের সামাজিক কারণ অন্তর্হিত হ'য়েছে। সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্ষয়রোগ শতকরা ৮৩ ভাগ হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ সোভিয়েট নরনারীর খাদ্য এবং বাসস্থান সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ মনোযোগ। ১৯৩৩-৩৭ সালের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাছ, মাংস, তৈল এবং শর্করা জাতীয় উপাদান গ্রহণের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। একজন সোভিয়েট অধিবাসী বর্ত্তমানে গড়ে দৈনিক ১০০ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ ক'রে থাকে; আর সে-তুলনায় নাৎসি জার্মানীতে প্রোটিন গ্রহণের গড়পড়তা পরিমাণ ছিল জন পিছু ৩৫ গ্রাম। সোভিয়েট আমলে শুধু শহরাঞ্চলেই প্রায় ৬৫ কোটি বর্গফুট পরিমিত জায়গায় বাসস্থান নির্ম্মিত হ'য়েছে।

অল্প পরিসরের মধ্যে সোভিয়েট জনস্বাস্থ্যের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তবে এক কথায় বলা চলে যে, ১৯৩৭ সালে রুশিয়ায় বিপ্লবপূর্ব্ব যুগের তুলনায় মৃত্যুহার শতকরা ৪০ ভাগ কমে গিয়েছিল;

শিশুমৃত্যুর হার কমে শতকরা ৫০ ভাগ। এদিকে যুদ্ধের পূর্ব্বে জন্মহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। ১৯৩৬ সালের তুলনায় ১৯৩৭ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শতকরা ১৮ জন লোক বৃদ্ধি ঘটে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, বৃদ্ধ বয়সে অথবা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় সোভিয়েট নরনারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক সমুদয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়ায় শতকরা ৭৩ জনের বর্ণপরিচয় ছিল না; আজ কয়েক বছরের সোভিয়েট শাসনে নিরক্ষরতার পূর্ণ অবসান ঘটেছে বলা চলে। দু'শ বছরের জারতন্ত্রে যে-সংখ্যক বিদ্যালয় রুশিয়ায় গ'ড়ে উঠেছিল, সোভিয়েট রুশিয়ায় কুড়ি বছরের মধ্যে তার চেয়ে বেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ১৯১৪ সালে রুশিয়ায় মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮১ লক্ষ; ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা ৪ কোটি ৭৪ লক্ষতে এসে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও এই অল্প সময়ের মধ্যে ৪ কোটি বয়স্ক লোককে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত ক'রে তোলা হ'য়েছে। মধ্য এশিয়ার অনগ্রসর রিপাব্‌লিকে শিক্ষার অভিনব প্রসার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিপ্লবপূর্ব্ব যুগের তুলনায় স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রদের সংখ্যা আজারবাইজানে ৩৫ গুণ, তুর্কমেনিস্তানে ৩৭ গুণ, উজবেকিস্তানে ৫৩ গুণ, আর্মেনিয়াতে ৬৮ গুণ এবং কিরঘিজিয়াতে ১৭২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১,৮,০০০০০ এবং ৬,৭০,০০০তে বৃদ্ধি করবার সঙ্কল্প করা হ'য়েছে। জনশিক্ষার জন্যে সরকারী ব্যয় সোভিয়েট রুশিয়াতে বেড়েই চলেছে। ১৯৩৭ সালে বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ৬১৮ কোটি রুবল ব্যয় করা হয়। অথচ জারের আমলে এর পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৬৭ লক্ষ রুবল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে এতদিন বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৯৪০ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্যে অত্যন্ত অল্প হারে 'ফি' ধার্য্য করা হয়। তবে স্বল্পআয়বিশিষ্ট পরিবারের ছাত্রকে বেতনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হ'য়েছে। তা ছাড়া গত কয়েক বছরে বিপুল আয়বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে ফি দেওয়া সহজ হ'য়ে পড়েছে। এদিক থেকে যদি সরকারী ব্যয় কিছুটা সঙ্কোচ করা যায় তো মন্দ কি? সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শুধু টাকার জোরে উচ্চ শিক্ষা অর্জ্জন করা যায় না; প্রতি বছর অযোগ্য ছাত্রদের ছাড়িয়ে দেবার নজির রয়েছে। মেধাবী ছাত্রের প্রতি সরকারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের জন্যে বৃত্তি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বর্ত্তমান।

শিক্ষার ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে সোভিয়েট মানসের অভিনব সমৃদ্ধি। জীবনকে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করবার এমন বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যম পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে-নূতন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে, তা আসলে খাঁটি গণ-সংস্কৃতি ব'লেই সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় ৯৬ লক্ষ অধিবাসীকে বুদ্ধিজীবীর পর্য্যায়ে ফেলা চলত। পরিবারবর্গকে নিয়ে সোভিয়েট জনসংখ্যাব শতকরা ১৩-১৪ জন ছিল এই স্তরের। বস্তুত মানসিক অনুশীলনের এরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা অন্যত্র কল্পনা করা সহজ নয়। মিউজিয়ম, থিয়েটার চিত্রশালা, গ্রন্থাগার প্রভৃতির এমন বিস্তৃত আদর পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে খুব কমই দেখা যায়; মিউজিয়মের সংখ্যা সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রায় আটাশ। ১৯১৪ সালে রুশিয়ায় ১৫৩টি থিয়েটার এবং ১৪১২টি

চিত্রশালা ছিল ; সোভিয়েট আমলে এদের সংখ্যা বেড়ে যথাক্রমে ৮৫০ এবং ৩০,০০০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯১৪ সালে রুশিয়ায় ক্লাব ছিল ২২২টি এবং এগুলি বিত্তবানদের অবসর বিনোদনের জন্যেই ব্যবহৃত হ'ত। ক্লাবের সংখ্যা সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ ৯৫,৬০০ এবং এর মধ্যে ৫৬,০০০ ক্লাবই শহরের বাইরে।

সত্তরটি ভাষায় সাড়ে আট হাজার সংবাদপত্র বর্ত্তমানে সোভিয়েট নরনারীকে সংবাদ পরিবেশন করে। বিপ্লবপূর্ব্ব যুগের তুলনায় সোভিয়েট রুশিয়াতে সংবাদপত্রের সংখ্যা ও প্রচার যথাক্রমে দশ ও চৌদ্দ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে! সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সোভিয়েট নরনারীর যোগ প্রত্যক্ষ। সোভিয়েট সাময়িকীর যে-কোনও সংখ্যাতেই শ্রমিক বা যৌথ চাষীর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক সমস্যার উপর নির্ভীক মতামত চোখে পড়ে। সোভিয়েট জনসাধারণ সংবাদপত্রের মারফৎ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের নানাবিধ প্রশ্ন ক'রে থাকে ; এর প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়। অসংখ্য নরনারী রোজ সংবাদপত্রের আপিসে এসে সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদকের নিকট নিজেদের সমস্যার কথা ব্যক্ত করে। এ ধরনের দর্শকের সংখ্যা 'প্রাভদা' আপিসে বছরে ১৮ হাজার এবং 'ইজভেস্তিয়া'তে বার হাজারের মতো। এ ছাড়া প্রত্যেকটি সমস্যার সচ্ছন্দ আলোচনার জন্যে পাঠক এবং সংবাদপত্র-কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাতের ব্যবস্থাও বর্ত্তমান। বোঝা কঠিন নয় যে, ব্যক্তিগত মালিকানার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ব'লেই সোভিয়েট সংবাদপত্র আজ প্রকৃত জনস্বার্থে ব্যবহৃত হ'তে পারছে। সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সোভিয়েট সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক নূতন জীবনের তরঙ্গে উদ্বেল।

শুধু মানসিক অনুশীলনই নয়, দৈহিক অনুশীলনেরও ব্যাপক

ব্যবস্থা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিপ্লবের পূর্ব্বে খেলাধূলা এবং অন্যান্য ব্যায়াম চর্চ্চা অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্দ্ধাশন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত জনসাধারণের খেলাধূলার অবসর কোথায়? এই কারণেই ১৯১৩ সালে ক্রীড়াগারের সংখ্যা রুশিয়ায় কুড়ির অধিক ছিল না। সে-জায়গায় আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে ক্রীড়াগারের সংখ্যা ৩০,০০০, স্টেডিয়ামের সংখ্যা ৬৫০ এবং উন্নততর খেলার মাঠের সংখ্যা ৭,২০০। এক কোটিরও অধিক লোক আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে নিয়মিত শরীর চর্চ্চা করে।

সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে জনসাধারণের সর্ব্বময় রাষ্ট্রিক কর্ত্তৃত্বে। বৃটিশ ও মার্কিন 'গণতন্ত্র' যে আসলে বুর্জোয়া একনায়কত্বেরই নামান্তর মাত্র, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পাওয়া গেছে। অনেকটা এর প্রতিবাদ হিসাবেই নভেম্বর-বিপ্লবের পরে সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিক-অধিনায়কত্ব দেখা দেয়। কিন্তু মজুর শ্রেণীর আধিপত্য যে আসলে পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম সোপান হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়, একথা অন্তত পক্ষে আজ ১৯৩৬ সালের নূতন শাসনপদ্ধতি প্রচলনের পর অস্বীকার করা অসম্ভব। বিপ্লব-পরবর্ত্তী যুগের রাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শোষক শ্রেণীর আমূল উচ্ছেদ। শ্রমিক-একনায়কত্বে সে-উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ফলে আজ রুশিয়ায় সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'য়েছে।

আঠার বছরের প্রত্যেকটি সুস্থমস্তিষ্ক সোভিয়েট নরনারী আজ ভোটদানের অধিকার ভোগ করে। ভোটের এমন ব্যাপক প্রচলন পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। প্রত্যক্ষ উপায়ে সোভিয়েট নির্ব্বাচন সম্পন্ন হয়। ভোটদাতারা নিজেরা সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত ক'রে থাকে। গোপনীয় ব্যালট প্রথায় ভোটদানের

ব্যবস্থা বর্ত্তমান। ভোটদাতাকে নির্ব্বাচনকেন্দ্রে একটি কার্ড দেওয়া হয়। নির্জ্জন কক্ষে কার্ডটি পূর্ণ ক'রে সে এটি ব্যালট বাক্সে নিক্ষেপ করে। নির্ব্বাচনক্ষেত্রে যদি কেউ ভোটদাতাকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করে, আইনত তার সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় সোভিয়েট গণতন্ত্রের বিশেষত্ব চমৎকার ফুটে ওঠে। সোভিয়েট জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক উত্তেজনা নির্ব্বাচনের সময় প্রকাশ পায়, পশ্চিমের ধনিকরাষ্ট্রে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নির্ব্বাচনের কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও যৌথ চাষী তাদের বিভিন্ন সংগঠনের ভেতর দিয়ে এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্থানীয় সোভিয়েট সভ্য ছাড়াও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ভোটদাতার তালিকা প্রস্তুতি ও সেগুলি যাচাই করবার কাজে সাহায্য করে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ভাষায় অসংখ্য ব্যালট কাগজ মুদ্রিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে যে-সকল প্রার্থী মনোনীত হয়, তাদের প্রত্যেকের গুণাগুণ নির্ব্বাচন-অঞ্চলে সহস্র সহস্র প্রকাশ্য সভায় আলোচিত হ'য়ে থাকে।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচনে সোভিয়েট জনসংখ্যার শতকরা ৯৯.৭ জন ভোটদানের ক্ষমতা ব্যবহার করে। 'সোভিয়েট অফ দি ইউনিয়ন'এর নির্ব্বাচনে কমিউনিস্ট এবং অদলীয় ব্লক একত্রে শতকরা ৯৯.১৮টি ভোট অধিকার করে। 'জাতিসমূহের সোভিয়েট'-এর নির্ব্বাচনে এরা লাভ করে শতকরা ৯৯.১৬ ভোট। সোভিয়েট নির্ব্বাচন কমিউনিস্ট পার্টির কারসাজি ব'লে যাঁরা গলাবাজি করেন, তাঁরা নির্ব্বাচনে অদলীয় ব্লক-এর অংশ গ্রহণের কথা ভুলে যান কি ক'রে? তা ছাড়া একথাও মনে রাখা দরকার যে, কোনো দেশে একাধিক রাজনৈতিক পার্টির স্বাভাবিক অস্তিত্ব আদতে সেখানকার সামাজিক

বৈষম্যেরই প্রমাণ। রুশিয়ায় জমিদার এবং ধনিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ হওয়ায় স্বভাবতই শোষক শ্রেণীর কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে নেই। বর্ত্তমান সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় যে-দুইটি শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও চোখে পড়ে, তাদের একমাত্র প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টি। এর পর যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাধান্য নজরে আসে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ কোথায় ?

সোভিয়েট পার্লামেন্টের দুই কক্ষ : 'সোভিয়েট অব্ ইউনিয়ন' এবং 'সোভিয়েট অব্ ন্যাশনালিটিজ্'। কক্ষ দু'টির ক্ষমতা সমান। এই সোভিয়েট পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক 'সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী' এবং 'মন্ত্রীদের সংসদ' নির্ব্বাচিত হ'য়ে থাকে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা জনগণের নির্ব্বাচিত সোভিয়েট পার্লামেন্টের উপরই ন্যস্ত। ২৩ বছরের প্রত্যেকটি রুশ নরনারী বিনাশর্ত্তে সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনে প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়াতে পারে। বৃটেনেও প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে—তবে দু'টি শর্ত্তে। প্রথমত, এরূপ ক্ষেত্রে দশ জন ভোটদাতার মনোনয়ন প্রয়োজন ; দ্বিতীয়ত, নির্ব্বাচনের সমস্ত ব্যয় বহন করবার উপযোগী সামর্থ্য থাকা চাই। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রয়োজনীয় আমানতের পরিমাণ দেড়শ পাউণ্ড ; নির্ব্বাচনী পুঁজি হিসাবে কমপক্ষে ৬০০ পাউণ্ডের দরকার। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এই বিপুল অর্থ ব্যয় ক'রে নির্ব্বাচনে দাঁড়ানো অসম্ভব ব'লেই বৃটিশ পার্লামেন্টে খাঁটি বৃটেনের কণ্ঠ কদাচিৎ শোনা যায়।

নির্ব্বাচক এবং প্রতিনিধিদের সম্পর্কের মধ্যে সোভিয়েট গণতন্ত্রের আসল চেহারা প্রকাশ পায়। প্রতিনিধিদের কার্য্যকলাপের উপর নির্ব্বাচক মণ্ডলী সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে তার নির্ব্বাচনকেন্দ্রের

ভোটদাতাদের কাছে স্বীয় কার্য্যের বিবরণী পেশ করতে হয়। নির্ব্বাচকদের নীতি থেকে ভ্রষ্ট হ'লে যে-কোন সময় তারা প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশের নির্ব্বাচক মণ্ডলী এবং প্রতিনিধিদের অদ্ভুত সম্পর্কের কথা মনে ওঠা স্বাভাবিক। নির্ব্বাচনের সময় কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে জনগণের ভোটের জোরে ক্ষমতার আসনে ব'সেই প্রতিনিধিরা যখন কৃষক-মজুরের উপর নিরঙ্কুশ অত্যাচার শুরু করেন, বেচারী ভোটদাতাদের তা নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।

জাতিসমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধান সোভিয়েট রুশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। বিপ্লবপূর্ব্ব রুশিয়াকে লেনিন বিভিন্ন জাতির জেলখানা আখ্যা দিয়েছিলেন। জারের আমলে গ্রেট রুশিয়ানদের উপরতলাকার অংশের হাতেই আসল কর্তৃত্ব ছিল। ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার অনগ্রসর জাতিগুলিকে দুঃসহ ঔপনিবেশিক জীবন যাপন করতে হ'ত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষের উপর ভর ক'রেই নভেম্বর-বিপ্লবের পূর্ব্বে অত্যাচারী জারতন্ত্র রুশিয়ায় কায়েম থাকবার চেষ্টা করে। জাতিবিরোধের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে দেশজোড়া ঐক্যের পথ প্রথম দেখায় বলশেভিকরা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়ে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ইউনিয়নের রিপাব্লিকের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার ক'রে নেওয়ায় সেখানকার প্রায় ষাটটি জাতি আজ একত্রে বন্ধুভাবে বাস করছে। এক বজ্রকঠিন ঐক্যসূত্রে যে সোভিয়েট জাতিগুলি যুক্ত, গত ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধেই তা প্রমাণিত হ'য়েছে। রুশিয়ায় আত্মশাসিত রিপাব্লিক ও আত্মশাসিত অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য ক'রে অনেক সমালোচক ব'লে থাকেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, এসব স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক বিকাশ

এমন যে এদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দিলেও এরা তা প্রয়োগ করতে অক্ষম। ভুললে চলবে না যে, এই ক্ষমতা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এদের সে-অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে যে খিরগিজিয়া ১৯২৬ সালে আত্মশাসিত বিপাব্লিকের মর্য্যাদায় উন্নীত হয়; ইতিপূর্ব্বে সে ছিল আত্মশাসিত অঞ্চলের পর্য্যায়ে। ১৯৩৬ সালে খিরগিজিয়াকে ইউনিয়ন বিপাব্লিক হিসাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। ১৯২০ সালে ক্যারেলিয়া আত্মশাসিত রিপাব্লিকে এবং ১৯৩৬ সালে ইউনিয়ন রিপাব্লিকে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্যে সোভিয়েট সরকারের দৃষ্টি কত সতর্ক তা স্পষ্ট ধরা পড়ে 'বিভিন্ন জাতির সোভিয়েট'-এর গঠনের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্লিক থেকে পঁচিশ জন, আত্মশাসিত রিপাব্লিক থেকে এগার জন, আত্মশাসিত অঞ্চল থেকে পাঁচ জন এবং জাতীয় এলাকা থেকে একজন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই সোভিয়েট কক্ষের মূল উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বার্থের পরিপূর্ণ বিকাশ।

সোভিয়েট দুনিয়ায় নরনারীর সমান অধিকার মেনে নেওয়া হ'য়েছে। বিপ্লবপূর্ব্ব রুশিয়ায় নারীকে মানুষের পর্য্যায়ে ফেলা চলত না। ১৮৯৭সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায় যে, সে-সময় চাকুরিজীবী মেয়েদের শতকরা ৫৫ জন জমিদার, ব্যবসায়ী বা সরকারী কর্ম্মচারীদের গৃহে দাসীর কাজে নিযুক্ত ছিল। শতকরা ২৫ জন ভূম্যধিকারীদের খামারে কাজ করত, শতকরা ৪ জন শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এবং শতকরা ১১ জন অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত ছিল। নভেম্বর-বিপ্লব রুশ নারীকে দীর্ঘ দিনের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্তা নারীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষে উন্নীত হ'য়েছে। মেয়েদের কাজের ধরনও সম্পূর্ণ ভাবে বদলে গেছে। নারী 'টেকনিশিয়ানে'র সংখ্যা সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ এক লক্ষেরও উপর; নারী চিকিৎসকের

সংখ্যা ৬৬ হাজারের মতো। নারীকে যাঁরা কঠিন কাজের অযোগ্য বিবেচনা করেন তাঁদের জানা প্রয়োজন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে সহস্র সহস্র মেয়ে ট্র্যাকটর-চালিকা বর্ত্তমান। এক লক্ষেরও বেশী সোভিয়েট মহিলা শারীরিক উৎকর্ষের নিদর্শন হিসাবে 'ভরোশিলভ-ব্যাজ' পরিধান ক'রে থাকে। উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা সোভিয়েট দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ। সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটে প্রায় দু'শত নারী সদস্যা। সামাজিক বাধা-নিষেধের বন্ধন থেকে মুক্ত সোভিয়েট নারী আজ মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন এবং যৌথ ফার্মের ভূমিকা সাগ্রহে লক্ষ্য করবার বিষয়। শতকরা ৮৫ জন শ্রমিক এখানে ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কর্ত্তব্য মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট পরিচালনা করা; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ায় শ্রমিক ধর্ম্মঘটের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও মালিকী প্রথার উচ্ছেদ হওয়ায় ধর্ম্মঘটের কোনও প্রয়োজন ঘটে না। এখানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ তাই প্রধানত শ্রমিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারণ, উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যাপারে মজুরদের সঙ্গে আলোচনা, বীমা তহবিলের বিলি-ব্যবস্থা, কারখানা পরিদর্শন, শ্রমিকদের জন্যে সংবাদপত্র প্রকাশ, শিক্ষা এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা এবং সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কারখানার আয় থেকে কিছুটা অংশ যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যে সঞ্চয় ক'রে রাখা হয়; কিছুটা রাখা হয় অন্য কারখানা খোলবার জন্যে, কিছুটা দেশরক্ষা এবং সরকার পরিচালনার জন্যে। বাকী অংশ কাজের তারতম্য ও দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। মিলের পরিচালকদের সঙ্গে শ্রমিকদের কোনো বিরোধ উপস্থিত হ'লে বিনা দ্বিধায় দোষী পরিচালককে বরখাস্ত

করা হয়ে থাকে। বার্নহামের শিষ্যদের কথাটা বিশেষ ক'রে মনে রাখা প্রয়োজন।

যৌথ চাষপ্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে সোভিয়েট কৃষকের জীবন আজ অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ: জার-শাসিত রুশিয়ায় ২৮ হাজার জমিদার ১৬ কোটি ৭১ লক্ষ একর জমির মালিক ছিল, আর এক কোটি কৃষকের অধিকারে ছিল মাত্র ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি; এর মধ্যে আবার অবস্থাপন্ন কুলাকদের দখলে ছিল অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর জমি। নভেম্বর-বিপ্লবের পর জমিদারী প্রথার অবসান এবং সম্মিলিত চাষ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সোভিয়েট কৃষকের জীবনকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে। উন্নততর কৃষির যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদনের বিপুল বিকাশ ঘটেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার অভাবনীয় সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ শতকরা ৯৩'৫টি কৃষক পরিবার যৌথ চাষের সুযোগ ভোগ করে। সম্মিলিত চাষ-প্রথায় যোগ দিতে হ'লে কৃষককে গৃহপালিত পশু এবং স্বকীয় সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রপাতি যৌথ ফার্মে অর্পণ করতে হয়। রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং আগামী বছরের বীজ ও মেশিন ক্রয় বাবদ কিছুটা বাদ দিয়ে রেখে বাকী অংশ যৌথ চাষীরা নিজেদের কাজের পরিমাণ ও দক্ষতা অনুসারে ভাগ ক'রে নেয়। যৌথ খামারের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে সম্মিলিত চাষ-ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে রুশিয়ায় যৌথ ক্ষেত্রের সংখ্যা ছিল ১,৬০০; সে-তুলনায় এর সংখ্যা আজ আড়াই লক্ষ।

যৌথ ক্ষেত্র ছাড়াও দেশে অসংখ্য সরকারী খামার আছে। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রায় সতের কোটি একর জমি নিয়ে সরকারী ক্ষেত্রের সংখ্যা ছিল ৩,৯৫৭। খাদ্যশস্য উৎপাদন ছাড়াও এই সব ক্ষেতে বিভিন্ন

কারখানার জন্যে কাঁচা মাল প্রস্তুত হয়। গত দশ বছরে সরকারী ক্ষেত্রে ট্র্যাকটরের সংখ্যা সাড়ে বারো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে উৎপাদনের পরিমাণের বিপুল প্রসার ঘটেছে। ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে স্টেট ফার্মের শ্রমিকদের উপার্জ্জন আড়াই গুণ বেড়ে গেছে।

উৎপাদনের উপায়গুলি ব্যক্তিগত অধিকারের কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার ফলে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের বৈদেশিক নীতির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। আভ্যন্তরীণ আর্থিক শক্তির চাপ বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে অনিবার্য্য ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ঠেলে দেয়। দুনিয়ার বাজার দখলের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় এরা কিভাবে অনগ্রসর দেশগুলি শৃঙ্খলিত করে, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পাওয়া গেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মুনাফা-প্রথার অবসান ঘটায় প্রসারের তাগিদ এখানে অনুপস্থিত। তাই ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র যেস্থলে পররাষ্ট্র লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সোভিয়েট ইউনিয়ন সে-জায়গায় পরাধীন দেশের স্বাধীনতার দাবীতে মুখর; ইঙ্গ-মার্কিন নীতি যেখানে স্পষ্টই বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক, সোভিয়েট নীতি সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তিপ্রয়াসী। দুনিয়ার বাজারে সশস্ত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামরিক প্রস্তুতির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে বরাদ্দ করতে হয় মোট বাজেটের প্রায় অর্দ্ধেক। আর সে-তুলনায় সোভিয়েট বাজেটের শতকরা মাত্র ২২ ভাগ আত্মরক্ষার জন্যে সামরিক বরাদ্দ।

যুদ্ধ শেষে ভূতপূর্ব্ব শত্রুরাষ্ট্রগুলি ব্যতীত সোভিয়েট সৈন্য ছিল ইরানে, মাঞ্চুরিয়ায় এবং ডেনমার্কের উপকূলে বিয়েরহোম্ দ্বীপে। গত বছর জুন মাসে সোভিয়েট বাহিনী শেষোক্ত দ্বীপ পরিত্যাগ করে। ইরান ও মাঞ্চুরিয়া ত্যাগের সংবাদ ১৯৪৬ সালের ৯ই এবং ১১ই মে যথাক্রমে ইরানের প্রধান মন্ত্রী ও সহকারী চীনা পররাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করেন।

১৯৪৬ সালের ২৮শে অক্টোবর মার্শাল স্টালিন জানান যে, জার্মানী অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী বুলগেরিয়া রুমানিয়া পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্রগুলিতে ৬০ ডিভিশন লালফৌজ অবস্থিত আছে। শীঘ্রই এদের ভিতর থেকে ২০ ডিভিশন দেশে ফিরিয়ে আনবার সঙ্কল্প তিনি ব্যক্ত করেন। স্টালিনের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পলিত হ'তে চলেছে। প্রাদেশিক আইন-পরিষদ এবং নব-নির্ব্বাচিত সরকারগুলির হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ ক'রে লালফৌজ জার্মানীর সোভিয়েট এলাকা থেকে কয়েক মাস পূর্ব্বে ব্যাপক ভাবে স'রে এসেছে। কিন্তু পরিত্যাগের পূর্ব্বে কোন জার্মানী তারা পেছনে ফেলে আসছে, তা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। পোট্‌স্‌ডাম চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর সোভিয়েট এলাকা থেকে ফ্যাশিজ্‌ম্ সম্পূর্ণ ভাবে উৎখাত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি একচেটিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ককে জাতীয় শিল্পে পরিণত ক'রে এবং জমিদারী প্রথা চূর্ণ ক'রে ২ লক্ষ ৮০ হাজার জার্মান কৃষকের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিয়ে সোভিয়েট অঞ্চলে গণতন্ত্রের দৃঢ় কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে। সোভিয়েট-শাসিত উত্তর কোরিয়াতেও দেখতে পাই যে, জমিদার ও মুনাফাখোরদের শোষণের অবসান ঘটিযে জনগণের হাতে আসল ক্ষমতা অর্পণ করা হ'য়েছে।

সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির ধারাবাহিক অথবা বিস্তারিত বিবরণ এখানে অসম্ভব। নভেম্বর-বিপ্লবের পর থেকে রুশিয়া বরাবর আন্ত-র্জাতিক শান্তি সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ ক'রে আসছে। ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের পর বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠককে যথার্থই কার্য্যকরী ক'রে তোলবার অক্লান্ত চেষ্টা রুশিয়াকে করতে দেখা যায়। ১৯৩৪ সালে রুশিয়ার বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘে যোগদান, আক্রান্ত দেশকে সাহায্যের জন্যে লিটভিনভের প্রস্তাব, স্পেন এবং চীনে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী শক্তির

সাহায্য প্রভৃতি ঘটনা দুনিয়াজোড়া ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সাধারণ শান্তি-ফ্রণ্ট গঠন প্রচেষ্টারই পরিচায়ক। কিন্তু পশ্চিমের ধনিক রাষ্ট্রগুলির সোভিয়েট-বিরোধী এবং হিটলার তোষণ নীতির ফলে রুশিয়ার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হ'য়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৩৮ সালের মিউনিক চুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের সমস্ত মুখোশ খুলে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৩৯ সালের মে মাসে ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ-প্রস্তাবও যখন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন চেম্বারলেন-দালাদিয়ের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, সোভিয়েট-বিরোধী আক্রমণ বিলম্বিত করবার উদ্দেশ্যে রুশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর পরবর্ত্তী ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছাত্রের অজানা নয়।

কোন কোন মহল থেকে সম্প্রতি কথা উঠেছে যে, সোভিয়েট রুশিয়া নাকি সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে পা বাড়িয়েছে। এ-ধরনের পণ্ডিতী গবেষণা কিছু নতুন না হ'লেও অভিযোগটি যাচাই ক'রে দেখা প্রয়োজন। ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারেও এক সময় এ-রকমের কথা শোনা গিয়েছিল; কিন্তু বুর্জোয়া প্রোপাগ্যাণ্ডার জাল ছিন্ন ক'রে ম্যানারহাইমের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হ'য়ে পড়বার পর আজকাল আর কেউ সেকথা তোলেন না। এবার অভিযোগ মূলত ইরান নিয়ে। সেজন্য ইরান সম্পর্কীয় সোভিয়েট নীতির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৯২১ সালের সোভিয়েট-ইরান চুক্তির শর্ত্ত অনুযায়ী ১৯৪১ সালের ২৫শে আগস্ট ফ্যাশিস্ত অনুচরদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে লালফৌজ ইরান প্রবেশ করে। বৃটিশ সৈন্য কোনো আইনসঙ্গত অধিকার না থাকা সত্ত্বেও একই কারণে এবং একই দিনে ইরানে ঢোকে। পরে ১৯৪২ সালের মার্চের

ইঙ্গ-সোভিয়েট-ইরান চুক্তি বৃটেনকে সৈন্যরক্ষার আইনগত অধিকার দান করে, তবে স্থির হয় যে যুদ্ধান্তের ছয় মাসের মধ্যে ইরান থেকে মিত্র-পক্ষীয় সৈন্য অপসারিত করতে হবে। নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদিও বৃটিশ সৈন্য দৃশ্যত স'রে এল, অন্তরাল থেকে এবং কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলের তৈলস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে উপজাতীয়দের যথেষ্ট সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। এদিকে সীমান্তেও ইরানের মন্ত্রিমণ্ডলীর সোভিয়েট-বিরোধী নীতির প্রমাণ মেলে। এর ফলে ১৯২১ সালের সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী সোভিয়েট রুশিয়া দাবী করে যে, অবস্থা পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত রুশ সৈন্য ইরান ত্যাগে অক্ষম।

এদিকে পার্শ্ববর্ত্তী সোভিয়েট আজারবাইজানের উন্নততর জীবনযাত্রার অনুপ্রেরণায় উত্তর ইরানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হ'য়ে ওঠে। উত্তর ইরানের আজারবাইজানের জনসাধারণের ভাষা এবং সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। এরা ইরানের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আত্মশাসনের দাবী তোলে। আজারবাইজানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-আন্দোলনকে সোভিয়েট-প্ররোচিত আখ্যা দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারকেরা উন্মত্ত সোরগোল তোলে যে, রুশ সৈন্য তেহেরান আক্রমণে উদ্যত। ইরানকে আসন্ন সঙ্কট থেকে ত্রাণ করবার মহান উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ইরানকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদনের জন্যে উত্তেজিত করতে থাকে। কিন্তু দরদের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ইরানের প্রতি এতটা হিতৈষণার মূল প্রেরণা যে সেখানকার তৈলস্বার্থ তা অনেকের নিকটই সহজ হ'য়ে আসে। অচিরেই ইঙ্গ-মার্কিন উত্তেজনাকে অমূলক প্রমাণ ক'রে রুশ-ইরান চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। স্থির হ'ল যে, ১৯৪৬ সালের ৬ই মের মধ্যে ইরান থেকে সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে। এ-চুক্তির শর্ত্ত যে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করা হ'য়েছে তা

স্বয়ং ইরানের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা থেকেই পরিস্ফুট। এই হচ্ছে ইরানে সোভিয়েট 'সাম্রাজ্যবাদের' আসল ইতিহাস।

বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে সোভিয়েটের দাবী যারা কান খাড়া ক'রে শুনছে, তারাই জানে যে প্রত্যেকটি প্রশ্নে সোভিয়েট গণতন্ত্র এবং পরাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ লড়ছে। সিরিয়া-লেবানন থেকে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণ, ফ্রাঙ্কো-স্পেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং গ্রীস থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নেবার দাবী কি সাম্রাজ্য বিস্তারের নমুনা, না, গণতন্ত্রের প্রতি প্রীতির প্রমাণ?

শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত সোভিয়েট সমাজ বিশ্ব-গণতন্ত্রের আশা এবং ভরসার স্থল। সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ আজ তাই নির্ণিমেষ নেত্রে এরই দিকে তাকিয়ে।

U. S. S. R. Speaks for itself
Soviet Communism—Sidney & Beatrice Webb
Socialist Sixth of the World—
Dean Hewlett Johnson
Soviet Democracy—Pat Sloan
How the Soviet State is Run—Pat Sloan
Iran at the Cross Roads
—Mohan Kumarmangalam

নয়া গণতন্ত্রের কাঠামো

বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সোভিয়েট গণতন্ত্র ছাড়াও আজকের পৃথিবীতে এমন এক নূতন ধরনের গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ মেলে যাকে 'নয়া গণতন্ত্র' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়। নয়া গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ রাষ্ট্রিক অধিকার ব্যতীতও এমন কতকগুলি আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী যার ফলে স্বভাবতই তারা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন এবং মূল শিল্পের জাতীয়করণ নয়া গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা চলে। নয়া গণতন্ত্রে পুরাতন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে ; জাতীয় অর্থনীতিকে সুশৃঙ্খল এবং জনহিতকর করবার উদ্দেশ্যে মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বে আনা হয়েছে। আর্থিক কাঠামোর এতটা প্রগতিমুখী পরিবর্ত্তনের ফলে নয়া গণতন্ত্রের অধীনে জনগণ স্পষ্টই পশ্চিমের 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের জনসাধারণের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু তথাপি ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত থাকবার ফলে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সোভিয়েট ব্যবস্থার পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে নয়া গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া 'গণতন্ত্র' এবং সোভিয়েট গণতন্ত্রের মাঝামাঝি স্তর হিসাবে কল্পনা করাই সঙ্গত।

উত্তর চীন

নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে উত্তর চীনের কথাই সকলের আগে মনে পড়ে। সমুদ্রতীরস্থ উত্তর কিয়াংশু এবং উত্তর হোনান, শাণ্টুং, হোপেই,

শানসি, সুইউয়ান, চাহার, জেহোল আর সীমান্তবর্ত্তী সেনসি-কানসু-নিয়েনশিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ভূমিব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে, এই বিরাট অঞ্চলে তেরো কোটি কৃষক আজ নূতন জীবন গঠনে রত। চীনের কৃষক-মজুরের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় উত্তর চীনের নবজাগ্রত জনশক্তি জাপানী অভিযান ব্যর্থ ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর চূর্ণ ক'রে মার্কিন অর্থে পুষ্ট দেশদ্রোহী চিয়াং কাইশেকের বর্ব্বর আক্রমণ পরাস্ত করতে চলেছে। লাল চীনের অধিবাসীদের এই বিপুল শক্তির মূল উৎস নয়া গণতন্ত্রের আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা।

'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নীতি ১৯২৭ সাল থেকেই চীন কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম্মসূচীতে গৃহীত হয়। ১৯৩৫ সালে জাপানী অগ্রগতির সামনে জাতীয় সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের তাগিদে জমিদারদের সঙ্গে সাময়িক রফার প্রয়োজন দেখা দেয়। তার ফলে জমিদারী ব্যবস্থা অবসানের দাবী কিছু দিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয় বটে, তবে খাজনা ও সুদের হার অনেক গুণ কমিয়ে আনা হয়। যুদ্ধান্তে জমিদারদের সঙ্গে আপোসের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে। ভূমি সংক্রান্ত নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ফলে বড় বড় জমিদারী লোপ পেয়েছে। যুদ্ধের সময় জাপানীদের সঙ্গে যে-সব জমিদার হাত মিলিয়েছিল, তাদের জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। পতিত জমিগুলি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। জমির খাজনা এবং সুদের হার অত্যন্ত কম থাকাতে গত কয় বছরে শান্‌সি-সুইউয়ান সীমান্ত অঞ্চলের পঞ্চাশ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক জমি পেয়েছে। শাণ্টুং প্রদেশস্থিত একটি জেলাতে গত আড়াই বছরে পাঁচ হাজারের বেশী দুঃস্থ পরিবার

সম্পন্ন কৃষকের স্তরে উন্নীত হয়, এবং পঞ্চাশটি মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষী পরিবার ধনীর পর্য্যায়ে ওঠে। সানসি-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলের দুই কোটি কৃষকের প্রত্যেককে জমির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য অনুযায়ী তিন থেকে ছয় মাউ (১ মাউ = ০'১৬৪৪ হেকটার) জমি ভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। এই ধরনের অবস্থা কুয়োমিণ্টাং চীনে কল্পনা করা অসম্ভব। খাজনার হার সেখানে এত উঁচু যে সাধারণ কৃষকের পক্ষে জমির মালিকানা বেশী দিন অক্ষুণ্ণ রাখা স্পষ্টই কঠিন। জমিহীনদের সংখ্যা দক্ষিণ চীনে তাই দ্রুত বেড়ে চলেছে।

কমিউনিস্ট-শাসিত উত্তর চীনে সমবায়-ব্যবস্থাকে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো হিসাবে খাড়া করবার ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। ইয়েনান অঞ্চলে মোট পনেরো লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১৯৪৪ সালে আড়াই লক্ষের উপর লোক সমবায়-সমিতির সভ্য ছিল। সমবায়-ব্যবস্থা যে এখানে প্রকৃতই গণ-সংগঠন হিসাবে গড়া হয়, তা ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ইয়েনানে অনুষ্ঠিত কো-অপারেটিভ সম্মেলন থেকেই ধরা পড়ে। এই সম্মেলনের ৭০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ছয় শতের অধিক ছিল কৃষক। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সমবায়ী অর্থনীতির কার্য্যকারিতা অত্যন্ত স্পষ্ট ফুটে ওঠে। যুদ্ধকালীন উৎপাদন-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাখবার কাজে সমবায়-সমিতিগুলিই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। কিন্তু কুয়োমিণ্টাং-এর মুনাফাখোরদের জন্যে চীনের সর্ব্বত্র সমবায়-ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হ'তে পারেনি। এরা এই সংগঠনগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবার চেষ্টা করায় দক্ষিণ চীনের অনেক স্থানেই এ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কুয়োমিণ্টাং চীনে সমবায়-সমিতির সংখ্যা ২,০০০ এবং সমিতির সভ্যসংখ্যা ২৫,০০০-এর উপরে উঠতে পারেনি।

চীনের নয়া গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা-প্রথা স্বীকৃত রয়েছে ব'লে মনে করা ভুল যে, শ্রমিক শ্রেণীর সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতি সরকার দৃষ্টিহীন। শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখানে সরকার গ্রহণ করেছেন। উত্তর চীনে নির্ব্বাচন উপলক্ষে জনগণ যেরূপ ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে, চীনের অন্য কোথাও তেমনটি চোখে পড়ে না। যদিও শাসনকার্য্য প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাতেই সম্পন্ন হয়, গভর্নমেণ্টে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব।

নয়া গণতন্ত্রের কর্ম্মধারার প্রতি চীনা জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান সমর্থন স্বভাবতই এর বস্তুনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তথাপি সমগ্র চীনে নয়া গণতন্ত্র কার্য্যকরী ক'রে তুলতে হ'লে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য। তার জন্যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন মার্কিন ফৌজের অপসারণ এবং কুয়োমিণ্টাং নেতৃত্বের অবসান।

চেকোস্লোভাকিয়া

নয়া গণতন্ত্রের ব্যাপক পরীক্ষা চ'লেছে পূর্ব্ব ইওরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ফ্যাশিস্ত শাসনের আগুনে পুড়ে এখানকার খাঁটি রূপ আজ ফুটে বেরিয়েছে। প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব ইওরোপে যে বিপ্লবী গণ-আন্দোলন জন্মলাভ করে, তার প্রচণ্ড আঘাত শুধু হিটলারী শাসন-ব্যবস্থাকেই চূর্ণ ক'রেছে তা নয়, জীর্ণ রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে। যে-বিস্তৃত ভূখণ্ড একদিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে উঠেছিল, আজ একমাত্র গ্রীস ব্যতীত সেই অঞ্চল সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ক'রে সামাজিক বিবর্ত্তনের নূতন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে।

চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং আলবেনিয়া নয়া গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক।

১৯৩৯ সালের মার্চে চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর হিটলারী দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে ১৯৪৫ সালে চেকোস্লাভ জনগণ সোভিয়েট মুক্তি-ফৌজের সহায়তায় হৃত স্বাধীনতা উদ্ধার করে। যে-সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চেক প্রতিরোধ আন্দোলনে সর্ব্বাপেক্ষা সংগ্রামশীল অংশ গ্রহণ করে, তাদের প্রধান ছয়টি পার্টির সহযোগিতায় জাতীয় ফ্রন্ট গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক সরকার বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফ্যাশিস্ত সহযোগী ভূম্যধিকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'এ্যাগ্রেরিয়ান পার্টি'কে বে-আইনী করা হয়। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়ায় অল্প কালের মধ্যে নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হ'ল। জাতীয় ফ্রন্টের পরিচালনায় জাতীয় শিল্পের শতকরা ৭০ ভাগ রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হ'য়েছে। ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানী খনি প্রভৃতি যাবতীয় মূল শিল্প ছাড়াও ইনজিনিয়ারিং শতকরা ৮৫ ভাগ এবং খাদ্যশিল্পের শতকরা কুড়ি ভাগ রাষ্ট্রের অধীনে আসে। ফ্যাশিস্ত সহযোগীদের সমুদয় সম্পত্তি জাতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হয়। যে-সব শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় সেগুলির পরিচালনার ব্যাপারেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হ'ল। এই জাতীয়করণের নীতি যে অচিরেই বিপুল সাফল্য লাভ করবে, কয়লা উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি থেকেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছয় মাসে রাষ্ট্রিক পরিচালনায় কয়লার উৎপাদন ১৯৩৭ সালের তুলনায় শতকরা ৮৮ ভাগ বেড়ে যায়, 'লিগনাইট' উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১৯ ভাগ। শ্রমিকদের দৈনন্দিন মজুরী ১৯৩৯ সালে তুলনায় চার গুণ

বেড়ে গেছে, জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বেড়েছে তিন গুণের কাছাকাছি।

গত যুদ্ধের পরে চেকোস্লাভ অধিবাসীদের শতকরা ৭১ জন যে পরিমাণ জমির মালিক ছিল, তার চেয়ে বেশী জমি ভোগ করত ভূমিবানদের শতকরা তুই জন। জাতীয় ফ্রন্ট গভর্নমেণ্টের আমলে পুরাতন ভূমিব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। জার্মান, হাঙ্গেরীয়, চেক এবং স্লোভাক জমিদারদের ভূমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। বাজেয়াপ্ত জার্মান জমির পরিমাণ প্রায় ৬৪ লক্ষ একর; এবং এর অর্দ্ধেকই চাষের উপযোগী। গড়ে একটি পরিবারকে ২৫ একর জমি দিলেও হিসাব ক'রে দেখা যায় যে, নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার চেক কৃষক পরিবার জমির মালিক হ'তে পেরেছে। স্লোভাকিয়ায় এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

জাতীয় ফ্রন্ট গভর্নমেণ্টের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি চেক-স্লোভাক জাতি-সমস্যার সমাধান। চেকদের অনুরূপ অধিকার স্লোভাকদের দেওয়া হ'য়েছে। স্লোভাকেরা আজ এক সার্ব্বভৌম জাতি হিসাবে স্বীকৃত। জাতীয় পরিষদে স্লোভাক প্রতিনিধির সংখ্যা এখন দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে গেছে।

সম্মিলিত সরকারের নীতি চেকোস্লাভ জনসাধারণের কতটা সমর্থন লাভ করেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় ১৯৪৬ সালের মে মাসের নির্ব্বাচনে। এই নির্ব্বাচনে জাতীয় ফ্রন্টের বামপন্থী দলগুলি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট পার্টি এবং বেনেসের সমাজতান্ত্রিক দল সমগ্র ভোটের শতকরা ৬৯ ভাগ অধিকার করে। এদের মধ্যে আবার কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার

বিষয়। বোহেমিয়া-মোরেভিয়া অঞ্চলে শতকরা ৪০ এবং স্লোভাকিয়া অঞ্চলে শতকরা ৩০ ভোট পেয়ে মোট ৭,০৮৯,৯৩৬ ভোটের মধ্যে কমিউনিস্টরা ২,৬৯৫,০৯৫ অর্থাৎ শতকরা ৩৭ ভোট লাভ করে।

কমিউনিস্ট নেতা ক্লেমেণ্ট গটওয়াল্ডের নেতৃত্বে গঠিত বামপন্থী সরকার অদূর ভবিষ্যতে চেকোস্লোভাকিয়ায় পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার আইন পাস করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি মূল শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৭ সালের উৎপাদন-কোঠার উপরে তোলা চেকোস্লাভ দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতির বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পনায় জনসাধারণের ভোগ্য-বস্তুর উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়ে তোলবার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। দুই বছরের মধ্যে দুধের উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ, মাখনের শতকরা ১০ ভাগ এবং ডিমের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নাৎসি লুণ্ঠনের ফলে চেকোস্লোভাকিয়ায় জাতীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। চেকোস্লাভ শিল্পের শতকরা ১০ ভাগ যদিও জার্মান ফ্যাশিস্তরা ধ্বংস করে, মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি। জনসংখ্যার দিক থেকেও গত যুদ্ধের ফলে চেকো-স্লোভাকিয়ার দুর্ব্বলতা অত্যন্ত পরিস্ফুট। এর উপর আবার সম্প্রতি সাড়ে সাত লক্ষ জার্মান শ্রমিককে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে।

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ নেই। চেকোস্লাভ জনসাধারণ আজ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে,

নবগঠিত রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্রিক স্বার্থের প্রতিভূ। তাই এই রাষ্ট্রের আহ্বানে সমস্ত বাধা ঠেলে তারা নিঃসন্দেহে দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সার্থক ক'রে তুলবে।

যুগোস্লাভিয়া

নূতন যুগোস্লাভিয়া নয়া গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান দুর্গ। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে যুগোস্লাভ রাষ্ট্র ফ্যাশিস্ত বাহিনীর সম্মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে। অক্ষশক্তির অভিযানকে বাধা দেবার ক্ষমতা বা স্পৃহা কোনটাই তখন প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীর ছিল না। ফলে যুগোস্লাভিয়ার দেড় কোটি নরনারীকে ফ্যাশিস্ত দাসত্বের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। জার্মানী, ইতালী, হাঙ্গেরী এবং বুলগেরিয়া যুগোস্লাভিয়ার অংশ বিশেষ অধিকার ক'রে বসে। অন্যান্য অংশে অক্ষশক্তির সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্যাশিস্ত অনুচর প্যাভেলিক এবং জেনারেল লেডিকের অধীনে ক্রোশিয়া এবং সার্ব্বিয়া নামে দু'টি তাঁবেদার রাষ্ট্র খাড়া করা হ'ল। যুগোস্লাভ জনগণের নিকট থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও গড়ে চল্লিশ ডিভিশন সশস্ত্র ফ্যাশিস্ত সৈন্য যুগোস্লাভিয়ার গণ-আন্দোলন দমনের জন্যে মোতায়েন রাখা হ'ল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও যুগোস্লাভিয়ার বিপ্লবী শক্তিকে দমন করা গেল না। চার বৎসর অক্লান্ত সংগ্রামের পর যুগোস্লাভিয়ার সম্মিলিত প্রতিরোধের আন্দোলন ফ্যাশিস্তদের সম্পূর্ণ ভাবে বিতাড়িত করে। শুধু তাই নয়; ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন শাসনব্যবস্থাকেও যুগোস্লাভিয়া থেকে চিরকালের জন্যে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্যেই নূতন যুগোস্লাভিয়ার জন্ম। নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনাও তখন থেকেই। মুক্ত অঞ্চলে জন-সমিতির হাতে শাসনভার অর্পিত হয়। এই সমিতি-

গুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে উচ্চতর সমিতি গঠন করা হ'ল। ১৯৪২ সালের নভেম্বরে বিহাকে জাতীয় মুক্তি-সমিতিগুলির প্রথম কংগ্রেস এবং ১৯৪৩ সালে নভেম্বরে জাজ্‌সেতে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়। কমিউনিস্ট নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে নির্ব্বাচিত অস্থায়ী সরকার যুগোস্লাভ রিপাব্‌লিকের কাঠামো গঠন করেন।

যুগোস্লাভিয়া থেকে সর্ব্বশেষ ফ্যাশিস্ত সৈন্য বিতাড়নের পর আঠার মাস অতীত হ'য়েছে। এই দেড় বছরে যুগোস্লাভ সরকারের কার্য্যাবলীর সঠিক খতিয়ান নিতে হ'লে যুদ্ধকালীন ক্ষতির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন। যুগোস্লাভ জনসমষ্টির শতকরা ১০ ভাগ ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে নিহত হয়। মোট শিল্পযন্ত্রের শতকরা ৭০ ভাগ বিনষ্ট হয়। কয়লা খনির যন্ত্রপাতির শতকরা ৫০ ভাগ, লোকোমোটিভের শতকরা ৭৬ ভাগ, রেল গাড়ীর শতকরা ৮৩ ভাগ, রেল লাইনের শতকরা ৬৫ ভাগ, জলযানের শতকরা ৮০ ভাগ এবং মোটর শিল্প ও কৃষিযন্ত্রপাতির প্রায় সমস্তই যুগোস্লাভিয়াকে হারাতে হয়। এর মধ্যে থেকে এত অল্প সময়ে নূতন যুগোস্লাভিয়া গ'ড়ে তোলা এক ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। এ সম্ভব হ'তে চলেছে শুধু জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং অসীম উৎসাহের ফলে।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে যুগোস্লাভিয়ার অস্থায়ী পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক যে ভূমিসংস্কার আইন পাস হয়, তাতে বিনা ক্ষতিপূরণে বড় বড় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হ'ল; এবং সাড়ে বাষট্টি থেকে পঁচাত্তর একর জমির বেশী দখলে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলে যে-সব মাঝারি কৃষকেরা জমিহীন হয়, তাদের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা হ'ল। বাজেয়াপ্ত জমি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিলি ক'রে দেওয়া হয়।

গত যুদ্ধের পূর্ব্বে যুগোস্লাভ শিল্পে নিযুক্ত মূলধনের অর্দ্ধেক ছিল

বৈদেশিক। ১৯৪৪ সলের ২১শে নভেম্বর জাতীয় মুক্তি-কাউন্সিলের এক বিশেষ নির্দ্দেশ অনুযায়ী যুগোস্লাভিয়াতে শত্রুরাষ্ট্র এবং সামরিক অপরাধীদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। জাতীয় শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বে আনা হ'ল। জাতীয় ব্যাঙ্ক, খনিজ সম্পদ, যানবাহন-ব্যবস্থা প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। এইভাবে সর্ব্বপ্রথম যুগোস্লাভিয়ায় নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'য়ে ওঠে।

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে যুগোস্লাভিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম নির্ব্বাচনে জনগণ প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করে। আঠার বছরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেককে জাতি ধর্ম্ম এবং স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাতে নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হ'ল। সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করা হয়। শতকরা ৯০ জন ভোটদাতা নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং মোট ভোটের শতকরা ৯০·৫ 'পিপ্‌ল্‌স ফ্রণ্ট' অধিকার করে।

১৯৪৫ সালের ২৯শে নভেম্বর যুগোস্লাভ রাষ্ট্রগঠন-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে, এবং সেইদিনই সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ ক'রে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডিসেম্বরের তিন তারিখে নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশিত হয়; দীর্ঘ দুই মাস ব্যাপী এই খসড়া নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী রাষ্ট্রগঠন-পরিষদ কর্ত্তৃক নূতন গঠনতন্ত্র গৃহীত হ'ল।

জমিদারী প্রথার অবসান এবং প্রধান প্রধান শিল্পের জাতীয়করণের নীতি নূতন শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হ'য়েছে। জমিতে

কৃষকের অধিকার মেনে নেওয়া হ'ল। সুদ এবং করের হার নিচু ক'রে বেঁধে অপেক্ষাকৃত গরীব কৃষকের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মূল শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের ফলে দেশী এবং বিদেশী শোষণের সমাপ্তি ঘটে। নূতন শাসনতন্ত্রে শ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠনের অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়, শ্রম-দিবসের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হ'ল, সামাজিক বীমা এবং বেতন সহ ছুটির ব্যবস্থা করা হয়।

জাতি-সমস্যার গণতান্ত্রিক মীমাংসা যুগোস্লাভ শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। যুগোস্লাভ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতীয় রিপাব্‌লিকের স্বাধীন সমান এবং সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এতদিন সার্ব, ক্রোট, স্লোভেন, বসনীয়, মণ্টিনিগ্রো এবং ম্যাসিডোনীয় এই ছয়টি প্রধান জাতির মধ্যে অহরহ কলহ যুগোস্লাভিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ক'রে তোলে। প্রত্যেকটি জাতীয় রিপাব্লিকের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার যুগোস্লাভিয়াকে আজ বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হিসাবে গ'ড়ে তোলা সম্ভব হ'য়েছে।

বুলগেরিয়া

১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর লাল ফৌজ কর্তৃক ফ্যাশিস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার পর বুলগেরিয়ায় পাঁচটি প্রধান গণতান্ত্রিক পার্টির সহযোগিতায় 'দেশহিতৈষী ফ্রণ্ট গভর্নমেণ্ট' গঠিত হয়। ফ্যাশিজমের শেষ চিহ্ন লোপ ক'রে এই সরকার বুলগেরিয়াকে নূতন ক'রে গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই গভর্নমেণ্টের আমলে জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'ল। সংবাদপত্রের, বক্তৃতার, সভাসমিতি ও শোভাযাত্রাব অবাধ স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল।

জনগণের মৌলিক দাবী স্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়ার গণ-সংগঠনগুলির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি চোখে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক জন-সমিতিগুলির অভূতপূর্ব্ব বিস্তৃতি ঘটে। জাতীয় জনবাহিনীর উপর দেশের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পিত হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সখ্যস্থাপন বুলগেরিয়ার বৈদেশিক নীতির আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া হ'ল।

বুলগেরিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাপক উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। শহরাঞ্চলের শ্রমিকরা গ্রামের কৃষকদের এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা শহরের মজুরদের সাহায্য ক'রে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে আজ বিপুল উৎসাহে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলছে। সম্প্রতি বুলগেরিয়ার আড়াই লক্ষ শিল্প-শ্রমিক, কারিগর এবং বুদ্ধিজীবী কৃষি-ব্যবস্থা সুগঠিত করবার কাজে গ্রামে কৃষকদের সাহায্য ক'রে এসেছে। কৃষকেরাও আবার এর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় শহরের শিল্প গঠনে সহায়তা করে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার তাৎপর্য্য অসামান্য। নবীন বুলগেরিয়ায় খাঁটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে, বুলগার জনগণের এই গভীর বিশ্বাসের ফলেই দেশব্যাপী সম্মিলিত গণ-উদ্যম সম্ভব হচ্ছে।

সমবায়-আন্দোলন বুলগেরিয়ার সাধারণ কৃষকের প্রাণে অপূর্ব্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে ইচ্ছামূলক ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে ৪০০ কৃষি-উৎপাদন-সমবায় গঠিত হয়। এতে যোগ দিয়েছে ৩৬ হাজার কৃষক পরিবার। যুদ্ধবিধ্বস্ত বুলগেরিয়া পুনর্গঠনের কাজে ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। 'ক্রুপ্‌নিক-কুলাতা' রেল

লাইন এবং 'বেলি জিসকার' বাঁধ এত শীঘ্র নির্ম্মিত হ'তে দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে আরও তিনটি বাঁধের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্প্রতি শেষ হ'য়েছে।

ফ্যাশিস্ত শাসক থেকে মুক্তির পর এ-পর্য্যন্ত বুলগেরিয়ায় যে দু'বার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হ'য়েছে, তা থেকেও বুলগার গণতন্ত্রের একটা দিক চমৎকার ফুটে ওঠে। উনিশ বছরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেককে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভোটদানের অধিকার দান করা হয়। এই সর্ব্বপ্রথম বুলগেরিয়ায় নারীদের রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকৃত হ'ল। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্যে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর নির্ব্বাচনে শতকরা ৮৬ জন ভোটদাতা অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে শতকরা ৮৮ জনের অধিক 'দেশহিতৈষী ফ্রন্ট'-এর পক্ষে ভোট দেয়। গত অক্টোবরে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর নির্ব্বাচনে ৪,২৪৪,৩৩৭ জন ভোটদাতা যোগদান করে। এর মধ্যে 'দেশহিতৈষী ফ্রন্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলি পায় ২,৯৮৩,৭৫৬ টি ভোট। বর্ত্তমান বুলগার সরকার দেশের জনসাধারণের কতটা আস্থাভাজন তা এ থেকেই ধরা পড়ে।

১৯৪৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর গণভোটে, বুলগেরিয়ার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয়। নূতন শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস ক'রে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করবার ব্যবস্থা চোখে পড়ে।

বুলগেরিয়ার জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে-পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশিত হ'য়েছে তাতে কৃষি ও শিল্পের বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্কল্প পরিস্ফুট। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগের বাৎসরিক ৩৫ লক্ষ টনের স্থলে কয়লার

উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৪০ লক্ষ টনে আনা হবে। পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনও যুদ্ধের আগের তুলনায় বৃদ্ধি করবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। বস্ত্র এবং অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হবে, যুদ্ধপূর্ব্বের ১৪ লক্ষ টনের জায়গায় গমের বাৎসরিক উৎপাদন ১৭ লক্ষ টনে তোলবার সঙ্কল্প করা হ'য়েছে।

রুমানিয়া

'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্ট' সরকারের অধীনে রুমানিয়া নূতন গণতন্ত্রের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ফ্যাশিস্ত জার্মানীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত রুমানিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণী ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই জনমত প্রবল হ'য়ে ওঠে; অবশেষে ১৯৪৫ সালের মার্চে রুমানিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্যাশিস্ত শোষণ পূর্ব্ব ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় রুমানিয়াকেও স্পষ্টই পঙ্গু ক'রে ফেলে। হিটলার-বাহিনী কর্তৃক রুমানিয়ায় যে-ক্ষতি সাধিত হয় তার পরিমাণ জাতীয় বাৎসরিক বাজেটের প্রায় দশ গুণ। এর উপর মুদ্রাস্ফীতি, চোরাকারবার এবং শস্যহানি এই ক্ষুদ্র দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে প্রায় ভেঙ্গে ফেলবার উপক্রম করে। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গ্রোজা-গভর্নমেণ্ট আর্থিক পুনর্গঠনের কাজে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কয়লা এবং তৈলশিল্পের উৎপাদন আজ দ্রুত বেড়ে চলেছে। রুশিয়া থেকে কাঁচামাল পাওয়ায় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন প্রায় যুদ্ধপূর্ব্ব পর্য্যায়ে ফিরে এসেছে।

ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন গ্রোজা-সরকারের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। পাশাপাশি সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের চাপে ১৯১৮-৩০

সালে রুমানিয়ায় আংশিক ভূমিসংস্কার ঘটে। এতে কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ভূম্যধিকারীদের শক্তির বিশেষ হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। ১৯৩০ সালেও রুমানিয়ায় সম্পত্তিবান কৃষকদের শতকরা প্রায় ৭৫ জনের যে-পরিমাণ ভূমি দখলে ছিল তার অর্দ্ধেক ভোগ করত ভূমিবানদের শতকরা ১ জনেরও কম লোক।

নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে বড় বড় জমিদারী কৃষকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পাঁচ শ'র বেশী জমিদারী এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া হয়; এর ফলে নয় লক্ষ কৃষক পরিবার ১২·৫ থেকে ২১ একর জমি লাভ করে। এ পর্য্যন্ত রুমানিয়ায় এক কোটি একরের বেশী জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হ'য়েছে। শুধু তাই নয়; অল্প খরচে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কৃষির যন্ত্রপাতি ধার দেবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে; কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের জন্যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সমবায়-সমিতির ব্যাপক গঠন চোখে পড়ে। ফলে রুমানিয়ার কৃষক শ্রেণী আজ সুদখোরের গ্রাস থেকে চিরকালের জন্যে মুক্ত।

বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইওরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রুমানিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। চেকোস্লোভ শ্রমিকের মজুরীর শতকরা ৩৮ ভাগ পেত রুমানিয়ার শ্রমজীবী। শ্রমিকদের দাবী সশস্ত্র সৈন্যের সাহায্যে দমন করা হ'ত। ১৯৩৩ সালে বুখারেস্টের ঐতিহাসিক রেল-ধর্ম্মঘটের সময় ৪২৭ জন শ্রমিক নিহত, ১,৮০০ জন আহত এবং ৭,০০০ জন করারুদ্ধ হয়; কারাগার থেকে যারা জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে তাদের সংখ্যা নগণ্য। রুমানিয়া জার্মান ফ্যাশিস্তদের দখলে আসবার পর শ্রমিক-আন্দোলনের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলে। এর পর এ্যান্টোনেস্কুর শাসনকালে একাধিক শ্রমিক-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে এক আইন অনুসারে রাজপথে দু'জনার অধিক লোকের

সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রোজা-সরকার গঠিত হবার পর শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'ল। রুমানিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আজ এক শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরেই এর সভ্যসংখ্যা তের লক্ষে এসে পৌছায়। শ্রমিক এবং শিল্প সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নে সরকার আজ ট্রেড ইউনিয়নের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গ্রোজা-গভর্নমেণ্ট গঠিত হবার ছয় মাসের মধ্যেই শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ২২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

গত নভেম্বর-নির্ব্বাচনে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্টের বিপুল বিজয় গ্রোজা-সরকারের গণতান্ত্রিক নীতির অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রমাণ। মোট ৪১৪টি আসনের মধ্যে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রণ্ট ৩৪৮টি আসন লাভ করে। নির্ব্বাচনে শতকরা প্রায় ৮৯ জন ভোটদাতা অংশ গ্রহণ করে ; এর মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি ৭১·৮ ভোট পায়।

হাঙ্গেরী

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো চূর্ণ ক'রে যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরী পূর্ব্ব ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় নূতন আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছে। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে হাঙ্গেরী ছিল বড় বড় ভূম্যধিকারীদের এক প্রধান ঘাঁটি। জমি-মালিকদের শতকরা ৮৫ জন যে-পরিমাণ ভূমি ভোগ করত, তার দ্বিগুণ জমি ভূমিবানদের হাজারকরা ৫ জনের অধিকারে ছিল। ১৯৩৫ সালের সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, সমগ্র চাষোপযোগী ভূমির শতকরা ৪৪·৫ ভাগ ১৬,০০০ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ; আর সে-তুলনায় ১৫ লক্ষ কৃষক সমস্ত জমির শতকরা ১২·৬ ভাগের মাত্র অধিকারী ছিল। যুদ্ধের আগে হাঙ্গেরীর ৮৭ লক্ষ অধিবাসীর

মধ্যে তের লক্ষ ছিল জমিহীন কৃষক এবং ৬ লক্ষ ভূমিদাস; তের লক্ষ নিম্নঅবস্থাপন্ন কৃষকের বার্ষিক গড় আয় দু'শ টাকারও নীচে ছিল।

গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরীতে পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ২৯০ একরের বেশী ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ১৫০ একরের অধিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৪৫০ একর পর্য্যন্ত বিস্তৃত জমিদারীগুলি ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিকার করা হয়; এর অধিক পরিমাণ সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে দখল করা হ'ল। বাজেয়াপ্ত জমি দরিদ্র কৃষক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ পর্য্যন্ত ৫৮ লক্ষ একর জমি এইভাবে সাত লক্ষ কৃষক পরিবারকে বিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। গড়ে একটি পরিবার ৭·৫ থেকে ৮ একর পরিমিত জমি লাভ করে। এ ছাড়া কৃষি-সমবায় গঠিত হওয়ায় হাঙ্গেরীতে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এখন নি'জর পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

আলবেনিয়া

ক্ষুদ্র দেশ আলবেনিয়া আজ দেশী এবং বিদেশী শোষণের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আলবেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থিতি, তৈল-শিল্প, আসফাল্টা সম্পদ এবং কাঁচামাল ইতালী, জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে অনেকদিন থেকেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের সাহায্যে এখানে বৈদেশিক পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী জমিদার এবং বিদেশী মালিকদের প্রভুত্ব আলবেনিয়ার দরিদ্র অধিবাসীর বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে।

আজ কিন্তু এখানে দুঃসহ শোষণের দিন শেষ হ'য়েছে। ফ্যাশিস্ত

দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে আলবেনিয়ার অধিবাসীরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে। জাতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের নেতা এলভার হোডসার নেতৃত্বে গঠিত জনপ্রিয় সরকার আলবেনিয়ায় দ্রুত নূতন সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলছেন। জার্মান ও ইতালীয় পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্ত ক'রে স্থানীয় তৈলশিল্প রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হয়েছে। তামাক, সাবান প্রভৃতি যে-সব শিল্প যুদ্ধাপরাধীদের দখলে ছিল, তাতে রাষ্ট্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। দেশব্যাপী সেচ-ব্যবস্থা বিস্তারের আয়োজন চলেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় কর্ষিত জমির আয়তন শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়ে গেছে।

আলবেনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গঠিত 'পিপ্‌ল্‌স্ ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট'-এর সংগঠনগুলি দেশব্যাপী পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

পোলাণ্ড

নূতন গণতান্ত্রিক পোলাণ্ড সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর সংগ্রামের পর নাৎসি শাসন উৎখাত ক'রে পোলিশ জনসাধারণ যখন প্রথম নিজেদের সরকার গঠন করে, বৃটেনে পলাতক প্রতিক্রিয়াশীল পোল সরকারের অনর্গল মিথ্যা প্রচার পোলাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। আজ কিন্তু সেই কদর্য্য প্রচারের কুৎসিত আবরণ ভেদ ক'রে গণতান্ত্রিক পোলাণ্ড মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। পুরাতন আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পোলাণ্ডে নয়া গণতন্ত্রের দৃঢ় বনিয়াদ গঠিত হয়েছে।

গত যুদ্ধের আগে পোলাণ্ডের জাতীয় অর্থনীতি বিদেশীদেরই করায়ত্ত

ছিল। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্তও পোলাণ্ডের ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যাণ্টের শতকরা ৮১·৩ ভাগ, ইলেকট্রিক টেকনিক্যাল শিল্পের শতকরা ৬৬·১ ভাগ, রাসায়নিক শিল্পের শতকরা ৫৯·৯ ভাগ, খনি লোহা এবং ইস্পাত শিল্পের শতকরা ৫২·১ ভাগ বৈদেশিক মুনাফাখোরেরা অধিকার ক'রে থাকে। দেশী ও বিদেশী শোষণের অবসান আজ পোলাণ্ডের জাতীয় অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ দিয়েছে। পোলাণ্ডে কার্টেল, ট্রাস্ট প্রভৃতি একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ ঘটেছে। ১৯৪৪ সালের জুলাইতে প্রকাশিত পোলিশ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ফতোয়া অনুযায়ী ব্যাঙ্ক বীমা খনি প্রভৃতি বড় ও মাঝারি শিল্পগুলি রাষ্ট্রের অধীনে আনা হ'য়েছে। এর ফল পেতে বিলম্ব হয়নি। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরেই কয়লার উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব্ব উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন নভেম্বর-পরিকল্পনার তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ, কেমিক্যাল এবং বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনেরও লক্ষ্যণীয় প্রসার ঘটে। জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পোলাণ্ড সম্প্রতি যে-ত্রিবার্ষিকী সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে, উল্লিখিত শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি থেকেই তার সাফল্যের আভাস মেলে। নূতন আর্থিক পরিকল্পনায় ১৯৪৮ সালের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব্ব পরিমাণের তুলনায় মাথা পিছু উৎপাদন ২·১৫ গুণ, জাতীয় আয় ১·২৫ গুণ, গুরুশিল্পের উৎপাদন ১·৬৬ গুণ, কয়লার উৎপাদন ২·২ গুণ, ইস্পাতের উৎপাদন ১·৩৯ গুণ বৃদ্ধির সঙ্কল্প করা হ'য়েছে।

জুলাই ইশ্‌তেহার অনুযায়ী জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এই কৃষি-বিপ্লবের ফলে পোলাণ্ডের ৬৭২৪ জন বড় ভূম্যধিকারীর ৮,৮৩২টি বিরাট জমিদারী

অর্থাৎ একুনে ৪০ লক্ষ একর জমি ৩০২,৮৯৩টি জমিহীন কৃষক পরিবারের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। ওডার ও নীসের তীরে স্লাভ অঞ্চলগুলি আবার ফেরত পাওয়ায় এক কোটি বার লক্ষ একর চাষোপযোগী জমি পোলাণ্ডের নূতন সীমার মধ্যে এসে পড়েছে।

বর্ত্তমান পোলিশ সরকারের নীতি জনসাধারণের কতটা সমর্থন ভোগ করে, তা ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুনের রেফারেণ্ডাম থেকেই বোঝা যায়। এই রেফারেণ্ডামে পোলাণ্ডের জনসমষ্টির শতকরা ৬৮·১ জন এককক্ষ পার্লামেণ্টের পক্ষে ভোট দান করে, শতকরা ৭৭·২ জন নূতন কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা সমর্থন করে এবং শতকরা ৯১·৪ জন পোলাণ্ডের নূতন পশ্চিম সীমান্ত অনুমোদন করে। গত ১৯শে জানুয়ারী পোল্যাণ্ডে প্রথম যুদ্ধোত্তর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে 'ডেমোক্র্যাটিক ব্লক' মিকোলাজিকের 'কৃষক পার্টি'কে অনেক পিছনে ফেলে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী

Red Star over China—Edgar Snow
I see a new China—George Hogg
Impressions of Czechoslovakia—Harry Pollitt
Land Revolution in Eastern Europe—
Mohan Kumaramangalam

উপসংহার

গণতন্ত্র অর্থে যদি জনগণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বোঝায়, তবে আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোথায় তার খানিকটা জবাব হয়তো বর্ত্তমান গ্রন্থে একেবারে দুর্লভ নয়। বৃটেন এবং মার্কিন দেশে নানা বৈচিত্র্য ছাপিয়েও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে তা যে স্পষ্টই বুর্জোয়া একনায়কত্বের প্রতিচ্ছবি মাত্র, তাতে দ্বিমত হওয়া কঠিন। বস্তুত শোষণ ও খাঁটি গণতন্ত্র কখনও একসঙ্গে চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে আজ তাই সকলের আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাই মনে পড়ে। লাল চীন এবং পূর্ব্ব ইওরোপের নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও শোষণের অবসান গণতন্ত্রের সার্থক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে।

পশ্চিমী 'গণতন্ত্র' রক্ষার অজুহাতে আজ দুনিয়াব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য বিশ্ব-গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন। কিন্তু ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করলে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে পর্য্যন্ত গণতন্ত্র-বিরোধী ব্লকের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হ'য়ে উঠছে। তা ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বারবার নানা ভাবে ফুটে বেরুচ্ছে। এ অবস্থায় সোভিয়েট-বিরোধী ব্লকের স্থায়িত্ব দীর্ঘ ব'লে মনে হয় না। কিন্তু তথাপি সোভিয়েট-বিরোধিতার সাধারণ সূত্রে দুনিয়ার মালিকেরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে আজ জরুরী প্রশ্ন: ভারতের পথ কি? ভারতবর্ষ কি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদতলে আত্মসমর্পণ করবে, না, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় বিশ্ব-গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ক'রে তুলবে? একদিকে দাসত্ব ও যুদ্ধ, অন্যদিকে স্বাধীনতা ও শান্তি। গণতান্ত্রিক ভারত কোন পথ বেছে নেবে?

ভারতীয় জনগণের কাছে এ-প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রক্তাক্ত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ভারতেও জাতীয় আন্দোলন বরাবর বিশ্ব-গণতন্ত্রের সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছে। বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাস এদিক থেকে গৌরবময় ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। ফ্যাশিজ্‌মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের গণ-আন্দোলন ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; অন্যদিকে আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি গণতান্ত্রিক ভারতের বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন সর্ব্বত্রই বিপন্ন জনগণের প্রতি ভারতবর্ষের পূর্ণ সমর্থন সুবিদিত। গত যুদ্ধে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; আগস্ট-প্রস্তাবের মৌলিক দাবী ছিল অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সার্থক যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ভারতবাসীর হস্তে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অর্পণ। আজ ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রের গণতন্ত্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের পথই বেছে নেবে।

গণতান্ত্রিক ভারতের আত্মরক্ষার উপায়ও একমাত্র এই পথেই। সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আক্রমণ আসলে বিশ্ব-গণতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশের উপর আঘাত। সে-আঘাত সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর গণ-স্বার্থের উপরও, কারণ সোভিয়েট স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বার্থ অভিন্ন। এখন বোঝা সহজ যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সমরায়োজনে

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সুযোগ দেওয়া ভারতের গণ-আন্দোলনের পক্ষে আত্মহত্যার পথ প্রস্তুতিরই সমান। ভারতের জাতীয় স্বার্থের তাগিদেই আজ সোভিয়েট-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম একান্ত স্থূল কারণেও আজ ভারতের পক্ষে অপরিহার্য্য। সম্ভাব্য সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে ভারতবর্ষকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করবার ব্যাপক আয়োজন শুরু হ'য়েছে। বিড়লা-ন্যুফিল্ড, টাটা-ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল, থ্যাকারসে-বৃটিশ টেক্সটাইল প্রভৃতি চুক্তির আড়ালে বৃটিশ মালিকেরা দীর্ঘদিনের জন্যে ভারতের বাজারে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদের সহযোগ স্বভাবতই রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছায়া ফেলেছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব আজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস-চেষ্টায় লিপ্ত। যুদ্ধান্তে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী যে বিপ্লবী গণ-আন্দোলন উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আজ তাকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলেছে। মাত্র এক বছর পূর্ব্বে ঐক্যবদ্ধ বিরাট জাতীয় আন্দোলনের স্থলে আজ দেশময় দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের লেলিহান শিখা।

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতৃত্বের বিরোধের সুযোগ নিয়ে যে সর্ব্বশেষ বৃটিশ পরিকল্পনা উপস্থাপিত হ'য়েছে, তা স্পষ্টই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে বিরাট বাধা স্বরূপ। মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনায় ভারতীয় সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের কিছুমাত্র চেষ্টা নেই; বরং জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখা চলে, সমগ্র

পরিকল্পনায় তারই প্রয়াস ফুটে বেরিয়েছে। পুরাতন পদ্ধতিতে আর উপনিবেশ শাসন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কাছে বৃটেন আংশিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু ভারত ব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে স্পষ্টই মরীয়া হ'য়ে উঠেছে।

মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা বৃটিশ বিভেদনীতির চূড়ান্ত ফল। দু'শ বছর ধ'রে ভেদনীতিকে আশ্রয় ক'রে দেশ শাসনের বিষময় পরিণতি ভারত বিভাগের এই সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এর জন্যে দায়ী ক'রে সাম্রাজ্যবাদ আজ বৃথাই সাধু সাজবার চেষ্টা করেছে। এই পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমানের দুইটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত রেখে রাষ্ট্র দু'টির প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখা।

মুসলীম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের সাহায্যে যাতে পাকিস্তানকে দীর্ঘদিনের জন্যে বৃটিশ ডমিনিয়নের মধ্যে রাখা যায়, সাম্রাজ্যবাদ তারই প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের দুর্ব্বল অর্থনীতির সুযোগে সেখানে বৃটিশ মূলধনের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল অভিসন্ধি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্বের সুযোগ না পেলেও টাটা-বিড়লা প্রমুখ মুনাফাখোর অংশীদারদের সহযোগিতায় এদেশের অর্থনীতিকে বৃটিশ মূলধনের চাকায় বেঁধে রাখবার আশা সাম্রাজ্যবাদের আছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের এক শক্তিশালী অংশের উপর ভারতীয় মালিকদের যে অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান তাকে ভরসা ক'রেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের সমরনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে পর্য্যন্ত স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করবার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

ভারতে অধ্যুষিত বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই এদেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা সে-ধার দিয়েও অগ্রসর হয়নি; বরং জাতীয় বিকাশকে যথাসাধ্য বাধা দেবারই ব্যবস্থা ক'রেছে। পাঠান জাতি আজ এক স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে উৎসাহী। কিন্তু তাদের সে-গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার ক'রে ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে যোগদানের জন্যে বাধ্য করা হচ্ছে। বাঙ্গালীদের মধ্যেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ন্যায়সঙ্গত অধিকার না মেনে ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা করা হ'ল।

এইভাবে দেশ বিভাগের ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তীব্রতর না হ'য়ে পারে না। সীমা নির্দ্ধারণ, ধনসম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা এবং সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু প্রশ্ন নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতে স্থায়ী বিবাদ ও সংঘর্ষের ক্ষেত্র রচিত হবারই সম্ভাবনা। এর পর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যদি সৈন্য বিভাগের ব্যবস্থা হয়, তবে ফল কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া এই বিভাগে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পষ্টই ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। কৃষি-অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হবে, যানবাহন ও সেচ ব্যবস্থা অযথা খণ্ডিত হবে। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত সুযোগ নিয়েই বৃটিশ তার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

হিন্দু ও মুসলমানের জন্যে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনই মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার শেষ কথা নয়। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যে-নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তা থেকেও বৃটিশ প্ল্যানের সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়। দেশীয় রাজারা যে-কোনও রাষ্ট্রগঠন-পরিষদে যোগদানের অথবা বাইরে থাকবার স্বাধীনতা লাভ করেছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের এই পঞ্চম বাহিনী ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের সঙ্গে প্রাণপণ দর

কথাকথির সুযোগ পাবে এবং ডোমিনিয়নদ্বয়কে বৃটিশ কমনওয়েলথে রাখবার অথবা ঐ উদ্দেশ্যে বৃটেনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানকে সাধ্যমতো চাপ দিতে সমর্থ হবে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে-সকল রাজ্যের উপর প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব প্রয়োজন, বৃটেন তাদের 'স্বাধীন' থাকবার জন্যে প্রাণপণ উস্কানি দিচ্ছে। বৃটেনের প্ররোচনায় এ-পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর সরকার এই ধরনের 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করেছে। এই দুইটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থিতির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে এদের 'স্বাধীনতা'র জন্যে বৃটেনের এতটা মাথাব্যথা কেন। হায়দ্রাবাদ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে বৃটেন শুধু ভারতীয় গণ-আন্দোলন নয় সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে। পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত ভারতের দক্ষিণ প্রত্যন্তস্থিত ত্রিবাঙ্কুরকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার বলা চলে। বোম্বাই হস্তচ্যুত হওয়ার পর সামুদ্রিক ঘাঁটি হিসাবে ত্রিবাঙ্কুরের মূল্য বৃটেনের পক্ষে অনেকখানি বেড়ে গেছে। তা ছাড়া এই রাষ্ট্র দু'টিই আজ বৃটেনের সামরিক প্রস্তুতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। ভারতের একমাত্র ব্রেনগান-ফ্যাক্টরী হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র এখানেই বিরাট বোমারু স্কোয়াড্রন বর্ত্তমান। হায়দ্রাবাদ থেকে ষাট মাইলে দূরে কামারেড্ডিতে কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতের বৃহত্তম গোলন্দাজ সমাবেশের আদেশ দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুরে সম্প্রতি এক বিরাট নৌ-ঘাঁটি নির্ম্মাণের সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ এখানকার মোনাজাইট ও থোরিয়াম সম্পদ, আণবিক বোমা নির্ম্মাণের জন্যে যা অত্যাবশ্যক। স্পষ্টই

বোঝা যায় যে, ভারতের গণ-আন্দোলন দমন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ত্রিবাঙ্কুরের 'স্বাধীনতা' আজ বৃটেনের পক্ষে অবাঞ্ছিত নয়।

ভারতবর্ষকে [illegible] রাষ্ট্রে বিভক্ত ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় ভারতে আসন্ন গণ-বিপ্লব ধ্বংস ও পরিকল্পিত সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধে এদেশকে সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা বৃটিশ চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদের এই জঘণ্য ষড়যন্ত্র চূর্ণ করবার কঠিন দায়িত্ব আজ ভারতের কোটি কোটি বিপ্লবী নরনারীর উপর। দেশময় আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। সে-দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করবার প্রকৃষ্ট উপায় ভারতের খণ্ডিত অংশগুলির মধ্যে নিবিড়তম সহযোগিতা স্থাপন। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে নূতন মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় আধিপত্য কায়েম রাখবার আশা করে। সে-দুরভিপ্রায় চূর্ণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বিস্তৃততম যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন।

এই পথেই আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানা সম্ভব। এই আঘাতের সাফল্য শুধু যে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারত গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করবে তাই নয়; দুনিয়া ব্যাপী গণতন্ত্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রের পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলবে।

জুন, ১৯৪৭